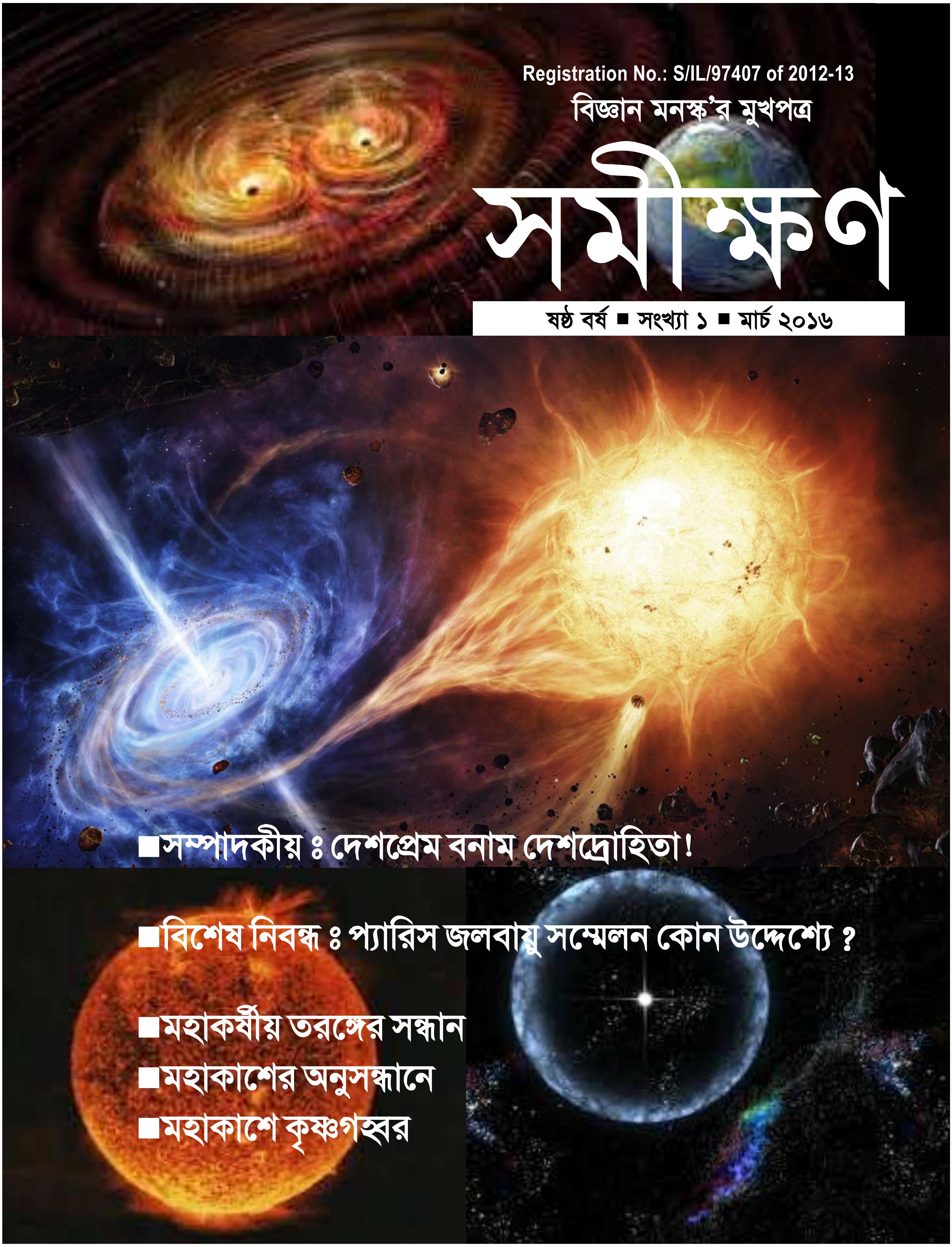

Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13
বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র
সমীক্ষণ
ষষ্ঠ বর্ষ ■ সংখ্যা ১ ■ মার্চ ২০১৬
■সম্পাদকীয় ঃ দেশপ্রেম বনাম দেশদ্রোহিতা!
■বিশেষ নিবন্ধ ঃ প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন কোন উদ্দেশ্যে ?
■মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান
■মহাকাশের অনুসন্ধানে
■মহাকাশে কৃষ্ণগহ্বর

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

সম্পাদকীয় ঃ	দেশপ্রেম বনাম দেশদ্রোহিতা!	৩
চিঠিপত্র ঃ		৫
সমাজ দর্পণ ঃ	কৃমির ওষুধ খেয়ে শিশুদের অসুস্থ হয়ে পড়া নিয়ে আতঙ্ক	৬
	মাদার টেরেসার সেন্টহুড প্রাপ্তি!	৭
মাইল ফলক আবিষ্কার ঃ	অবশেষে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান মিলল	৯
মহাকাশ বিজ্ঞানের সাধারণ পরিচয় ঃ	মহাকাশের অনুসন্ধানে	১৩
	মহাকাশে কৃষ্ণগহ্বর	১৭
বিশেষ নিবন্ধ ঃ	প্যারিস-জলবায়ু সম্মেলন কোন উদ্দেশ্যে ?	২০
জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান ঃ	কেন কোনো মশা জিকা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় অথচ এইচ আই ভি'র মত ভাইরাস সংক্রমণে ভূমিকা নেয় না?	৩২
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩৩
বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ	জীব বিবর্তনের মূলে প্রাকৃতিক নির্বাচন নাকি মিউটেশন!	৩৫
	হাঙরের ভার্জিন বার্থ	৩৫
	যীশু'র মুখশ্রী প্রসঙ্গে	৩৬
আবিষ্কারের কাহিনী ঃ	স্টেথোস্কোপ এবং এর আবিষ্কারের বিস্ময়কর কাহিনী	৩৭

সম্পাদকীয় ঃ

দেশপ্রেম বনাম দেশদ্রোহিতা!

গত ৯ই ফেব্রুয়ারি রাজধানী দিল্লীর জওহর লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একাংশ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে ২০১৩ সালে ফাঁসি হওয়া কাশ্মিরী আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়। বিগত দুই বছর এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছিল এবং এবারও কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু এবিভিপি'র বিরোধিতায় এবং কোনো কোনো মহলের চাপে শেষ মুহূর্তে অনুমতি প্রত্যাহার করায় আয়োজকরা একটি হস্টেল ক্যান্টিনে তা উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করে। ওই অনুষ্ঠানে জাতীয়তাবাদ বিরোধী, দেশ বিরোধী, রাষ্ট্র বিরোধী স্লোগান বা ভাষণ দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগ এনে ছাত্র সংসদের সভাপতিসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার পর দেশজুড়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে দেশপ্রেম-দেশদ্রোহিতা, রাষ্ট্রপ্রেম-রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বাক্ স্বাধীনতা, সভা সমিতির করার স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্ক। সর্বস্তরের সংবাদ মাধ্যমগুলি এই বিতর্ককে এক উচ্চতানে বেঁধে প্রায় গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করেছে। রাজনৈতিক ময়দানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যার যার ফলস তুলতে ব্যস্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

সংঘ পরিবারের ছাত্র তথা অন্য শাখাসংগঠনগুলি অভিযোগ তুলেছে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয়তাবাদ বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহীদের আখড়া হয়ে উঠেছে। এখন দরকার দেশপ্রেমের জাগরণ। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে, ২০৭ ফুট উঁচু জাতীয় পতাকা টাঙিয়ে সকলকে তাকে স্যালুট করতে বাধ্য করাতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিটারি ট্যাঙ্ক মোতায়েন করতে হবে। শেষ আর্জি বাদে বাকি আর্জিগুলি কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রক মেনে নিয়ে অর্ডার জারি করেছে।

এখন প্রশ্ন হল সংঘ পরিবারের জাতীয়তাবাদ কী? তাদের প্রচারিত দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদ হল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প সে দেশে মুসলমান বিদ্বেষকে মূলধন করেছেন, অতীতে হিটলার ইহুদি বিদ্বেষকে মূলধন করেছিলেন এও তেমনি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ। অথচ ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামে আর এস এস বা হিন্দু মহাসভার অংশগ্রহণের কোনো ইতিহাস নেই।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে জাতীয়তাবাদের ধারণার উদ্ভব হয়েছিল একটি বিশেষ অর্থনৈতিক পর্যায়ে। সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের পুঁজিপতিশ্রেণী তার বাজার ধরে রাখার স্বার্থে, বাজার বিস্তারের স্বার্থে জাতির অধিকার বা জাতীয়তাবাদের আন্দোলন করেছিল। এইভাবে ইউরোপে নির্দিষ্ট ভূখন্ডে ভাষার ভিত্তিতে জাতি রাষ্ট্রগুলি গড়ে উঠেছিল। ভারত কোন একটি জাতির রাষ্ট্র নয়, ভারত বহুরাষ্ট্রীক। এখানে বাঙালী, মারাঠী, তামিলি, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, তেলেঙ্গী, গুজরাতী, বিদর্ভী, ভোজপুরী, মগধী ইত্যাদি জাতি এবং কাশ্মিরী, গোর্খা, অসমীয়, নাগা, খাসী-জয়ন্তিয়া, গারো, ত্রিপুরী ইত্যাদি নানা জাতি ও জনজাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব আছে। ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন এবং শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতীয় ভূখন্ডে অসংখ্য জাতিরাষ্ট্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটাই সমাজবিজ্ঞানীদের মূল্যায়ন। বর্তমান ভারত একটি জাতিরাষ্ট্র যে নয় তা বর্তমান সংবিধান বিচার করলেই বোঝা যায়। ভারতরাষ্ট্র হল ইউনিয়ন অব স্টেটস্ বা সম্মিলিত জাতিরাষ্ট্র। কিন্তু এই সম্মিলন কি স্বেচ্ছামূলক হয়েছিল বা তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার কি স্বীকৃত? না ইতিহাস প্রমাণ করে ১৯৪৭ পূর্ববর্তী প্রায় ৭০০ ব্রিটিশ ভারতীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশের ভারত বা পাকিস্তানভূক্তি স্বেচ্ছামূলক ছিল না, জম্মু-কাশ্মীর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া, মণিপুরে সেখানকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং বলপূর্বক ভারতে যুক্ত করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনুপ্রবেশ করে। এরপর ভারতের দ্বারা দখলীকৃত অংশ শর্তাধীনে ভারত ডোমিনিয়নে যুক্ত হয়। প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কাশ্মীরী জনতার রায় বা গণভোট নেওয়ার

সিদ্ধান্ত হয় রাষ্ট্রসংঘে। ভারত সরকার প্রথমে রাজী থাকলেও পরে এই প্রস্তাব খারিজ করেছে। তাদের যুক্তি কাশ্মীরের তৎকালীন রাজা হরি সিং ভারত ভুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার জনতা কি সায় দিয়েছিল? আজও দেয়নি বলেই উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির ন্যায় কাশ্মীরে ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম চলছে। তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার বিরোধিতা করে আর স্থানীয় স্তরে ওই জাতি-জনজাতিগুলি সংগ্রাম করে। 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ'-এর কাছে যা দেশদ্রোহ তাই কাশ্মীরী-নাগা-মিজো-মণিপুরীদের কাছে দেশপ্রেম। বহুরাষ্ট্রীক দেশে একমাত্র পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং স্বেচ্ছা সংযুক্তির অধিকার দিয়েছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি নয়।

শুধু তাই নয়, ভারত সরকার এবং তার দ্বারা প্রচারিত 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' অতীতে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে সমর্থন করে সেখানে সেনা অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ গঠন করেছিল। অথচ শ্রীলঙ্কায় তামিল জাতিগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে বিরোধিতা করে শ্রীলঙ্কা সরকারের সাথে সেনা অভিযান চালিয়ে সেই আন্দোলনকে দমন করে চলেছে। আর সংঘ পরিবারের হিন্দু জাতীয়তাবাদ দাবি করছে আফগানিস্তান-পাকিস্তান-কাশ্মীর-তিব্বত-নেপাল-ভূটান-মায়ানমার-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-জাভা-সুমাত্রা নিয়ে অখন্ড ভারত রাষ্ট্র গঠন করবে। যারা এই নীতির সমালোচনা করবে তারা নাকি দেশদ্রোহী! বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে জাতীয়তাবাদ অন্ধ রাষ্ট্রবাদ ছাড়া কিছু নয়। তার লক্ষ্য হল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী হানাদারি চালাবার অধিকার অর্জন। সংঘবাদী জাতীয়তাবাদ দেশজুড়ে এই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এদের এই জাতীয়তাবাদ মনুবাদী দর্শন দ্বারা চালিত। যেখানে অহিন্দু খ্রিস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈনদের শুধু নয় তার সাথে অস্পৃশ্য দলিত-আদিবাসী জনতাকেও ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য স্বীকার করতে হবে। হায়দারবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা আমাদের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

রাজনীতির আঙিনায় যখন এই জাতীয়তাবাদ, এই দেশপ্রেমের জয়গান চলছে তখন অর্থনৈতিক আঙিনায় চলছে এর বিপরীত কার্যক্রম। সারা পৃথিবীকে এখন বলা হচ্ছে এক গ্লোবাল ভিলেজ। বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলিই এখন দুনিয়ার মালিক। একদেশে কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন হলেও বিশ দেশে তার মাল উৎপন্ন হচ্ছে এবং একশ দেশে তার বাজার ছড়িয়ে পড়ছে। এখানে জাতীয়তাবাদের টিঁকিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী যে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র আওয়াজ দিয়েছেন তাতে তিনি সারা বিশ্বের পুঁজিপতিদের এদেশে এসে মাল বানিয়ে মুনাফা কামানোর প্রস্তাব দেন নি কি? যে পাকিস্তানকে দেশের শত্রু বলা হচ্ছে সেই দেশে ভারতীয় পুঁজিপতিরা ব্যবসা কি বন্ধ করেছে, নাকি পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা ভারতে?

এখন আসার যাক বাক্ স্বাধীনতার প্রসঙ্গে। অতীতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় বা মন্তব্যে বলা হয়েছিল – কোন ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে হিংসাত্মক কাজে উস্কানি না দিলে তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ (sedition) আইন প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা বললেও, বহুরাষ্ট্রীক ভারতে কোনো একটি জাতির স্বাধীনতার কথা বললেও তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ আইন প্রযোজ্য নয়।

কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে। সামাজিক অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় বহু মানুষ আজ কারাগারে আছেন। যে আফজল গুরুর ফাঁসির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করার জন্য জে এন ইউতে এত হইচই, সেই আফজল গুরু'র ফাঁসি আইনসঙ্গতভাবে হয়নি এই অভিযোগ বিভিন্ন সরকারি মহল, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক নেতারা বহুবার ব্যক্ত করেছেন। কাশ্মীরে শাসন ক্ষমতায় আসীন বর্তমান বিজেপি জোটের প্রধান শরীক পিডিপি তো আফজলের দেহ চেয়েছেন কবরস্থ করে শহীদের মর্যাদানের জন্য। অথচ জে এন ইউ'র ছাত্রদের একাংশ এই প্রশ্ন তোলায় তাদের দেশদ্রোহী বলা হয়েছে। তাছাড়া জে এন ইউ'র ছাত্র সংসদের সভাপতি ভারত বিরোধী কোনো কথা না বলা সত্ত্বেও, কাশ্মীরের স্বাধীনতার সপক্ষে কোন মন্তব্য না করা সত্ত্বেও পুলিশ দ্বারা আনীত রাজদ্রোহের অভিযোগ আদালত গ্রহণ করে শর্তাধীনে তাকে ৬ মাসের জামিনের রায় দিয়েছে এবং বলেছে কানহাইয়াকে জাতীয়তাবাদ বিরোধী কাজে বিরত থাকতে হবে। এই হল গণতান্ত্রিক অধিকার!

সুতরাং জে এন ইউ'র আন্দোলনকে ঘিরে যে বিতর্কগুলি সমাজে উঠে এসেছে তাকে অন্ধভাবে বিচার না করে যুক্তিবাদ ও সমাজবিজ্ঞানের আলোকে বিচার করাই প্রতিটি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কর্তব্য। বর্তমান যুগে ধর্মীয় মোড়কে পেশ করা অন্ধ উগ্রজাতীয়তাবাদ সামাজিক বৈষম্যকে টিঁকিয়ে রাখার এক বড় হাতিয়ার। এই ছদ্মদেশপ্রেমের মুখোশ খুলে দিতে পারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।■

চিঠিপত্র ঃ

মাননীয় সম্পাদক,

গত ২ বছর ধরে সমীক্ষণের বিভিন্ন রচনা আমি পড়ি এবং বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে একসাথে তার চর্চাও করি। সমীক্ষণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। বিজ্ঞানের নিয়মের কথা অনেকেই বলে কিন্তু তারা তা জনমানসে প্রচার করে না। বর্তমান সমাজে যে সংস্কৃতি চলছে সমীক্ষণ তার ঊর্ধ্বে উঠে আগামী সমাজের সংস্কৃতির কথা বলে।

তবে সমীক্ষণের সব লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা কঠিন। আপনারা আমাদের মত গ্রামের মানুষের কথা ভাবুন। মানবসমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সমীক্ষণের মর্মবস্তু আরও বেশি করে নিয়ে যেতে হবে সমাজটা পাল্টানোর জন্য প্রস্তুত করতে।

এই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে তাদের মনের অন্ধকার দূর করার কাজে আরও সক্রিয় ভূমিকা আশা করে আমার কথা শেষ করলাম।

মাজিবুর রহমান
নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ

সম্পাদকের জবাব ঃ

আমরা আপনার পরামর্শের মর্যাদাদানের সাধ্যমত প্রয়াস রাখব। একাজে আপনারাও এগিয়ে আসুন। বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্য হোন।

মাননীয় সম্পাদক,

সমীক্ষণ (সংখ্যা ২-নভেম্বর ২০১৫) আমার হস্তগত হয়েছে। অতীতের সংখ্যাগুলি যদি আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তবে খুবই উপকৃত হব। ডাক যোগে মূল্য পাঠিয়ে দেব।

আপনাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা সম্বন্ধে বিগত ৩৫-৪০ বৎসর পূর্ব থেকেই আমি বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। মনে হচ্ছে আপনারা প্রবীর ঘোষীয় কুযুক্তিবাদের শিকার হয়েছেন। প্রবীর ঘোষ তাঁর ভুল বুঝতে পেরে অনেক আগেই গা-ঢাকা দিয়েছেন।

যাই হোক, আপনাদের লেখার জবাবে ধারাবাহিকভাবে আমি লেখা পাঠাব। আশাকরি সমীক্ষণ-এ প্রকাশ করে সততা এবং বিজ্ঞান মনস্কতা বজায় রাখবেন। স্মরণে রাখা দরকার, চার্বাকান্ধতা বা মার্ক্সান্ধতা বা নাস্তিকতা এবং বিজ্ঞান মনস্কতা এক জিনিস নয়। বিজ্ঞান কোনও মতবাদের গোলামি করে না। কেবল সত্য অনুসন্ধান করে। ধর্ম, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে আপনাদের পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। সে সম্বন্ধে জানিয়ে দেওয়ার জন্যই এই পত্রের অবতারণা।

নমস্কারান্তে
নরেন্দ্রনাথ মাহাতো
পশ্চিম মেদিনীপুর

সম্পাদকের জবাব ঃ

মাননীয় নরেন্দ্রনাথবাবু,

আপনি সমীক্ষণ পত্রিকার একটিমাত্র সংখ্যা হাতে পেয়েই বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবস্থানে পৌঁছে গেছেন এবং আমরা 'প্রবীর ঘোষীয় কুযুক্তিবাদের শিকার' সেটা বুঝে ফেলেছেন বলে জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি আমরা 'গা-ঢাকা দিতে' উদয় হই নি বরং যারা অন্ধকার কুসংস্কারের জালে সাধারণ মানুষকে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গা-ঢাকা দিয়ে, তাদের স্বরূপ উন্মোচনের কাজেই নেমেছি।

আপনাকে এটাও জানানো প্রয়োজন যে সমীক্ষণ বিজ্ঞানের বিরোধী এবং ধর্মীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তাই আপনার বিজ্ঞান বিরোধী ভাববাদী দর্শনে সিক্ত রচনাগুলি প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য নই। সমীক্ষণের রচনাগুলির বিরুদ্ধে আপনি বরং আপনার পুস্তক বা পত্রিকায় রচনা লিখে পৃথকভাবে প্রচার করুন। গুরুত্ব অনুভূত হলে আমরা আমাদের পত্রিকায় আপনার রচনার জবাব দেব, যেমন গত ২০১৪ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় আমরা সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার রচনা খন্ডন করেছি। আমরা আমাদের মতামতের ভ্রান্ততা-অভ্রান্ততা অবিজ্ঞানের, অপবিজ্ঞানের আলোকে বিচার করতে চাই না, বিজ্ঞানের আলোকেই তার বিচার করে যাব এবং ভুল হলে শুধরে নেব। তবে সমীক্ষণের অনিঃশেষিত সংখ্যাগুলি আপনাকে অবশ্যই প্রেরণ করা হবে আপনার রচনা প্রস্তুতির প্রয়োজনে।

ধন্যবাদান্তে
সম্পাদক

সমাজ দর্পণ ঃ

জাতীয় কৃমিনাশক দিবসে কৃমির ওষুধ খেয়ে শিশুদের অসুস্থ হয়ে পড়া নিয়ে আতঙ্ক

গত ৯ই মার্চ ছিল জাতীয় কৃমিনাশক দিবস। ঐদিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় স্কুলের ছোট বাচ্চাদের স্কুলে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়। এই ওষুধ খেয়ে অনেকে বমি করতে থাকে, ঝিমিয়ে পড়ে। এক বাচ্চার দেখাদেখি অন্য বাচ্চাদের মধ্যেও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মা-বাবারা ছুটে আসেন। হইচই, ভাঙচুর শুরু হয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে এক বাচ্চা নাকি মারা গেছে! হাজার হাজার শিশুদের নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলায় অভিভাবকরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। সর্বত্র গোলমাল, অশান্তির পরিবেশ তৈরী হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের পাশাপাশি আধা সামরিক বাহিনী নামান হয়। বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে সন্ধ্যার পর মানুষ আমাদের ফোন করে বিষয়টা জানতে চান। আমরা তাদের সাধারণ পরামর্শ দিয়ে সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন **হেল্থ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের** সাথে যোগাযোগ করি। ডাক্তার বাবুরা আমাদের জানান অত আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। কৃমির ওষুধ অ্যালবেন্ডাজল অত্যন্ত নিরীহ ওষুধ। ওষুধে কোন গোলমাল আছে কিনা তা পরদিন (১০ই মার্চ) দুপুরের পর জানা যাবে। আমরা পরদিন ১০ই মার্চ ২০১৬ সংগঠনের দুই ডাক্তার বাবুর সাথে কথা বলি। ডঃ হীরালাল কোনার এবং ডঃ স্বপন জানা আমাদের যা বলেছেন পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রথমে আমরা তা প্রকাশ করলাম।

বিজ্ঞান মনস্ক ঃ গতকাল ৯ই মার্চ দঃ ২৪ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫ বছর বা তার কম-বেশি বয়সের বাচ্চাদের যে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল তাতে নাকি হাজার হাজার শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? এর কারণ কী?

ডঃ স্বপন জানা ঃ প্রথমতঃ এটা ওষুধ আতঙ্ক হয়েছে। দ্বিতীয়ত ওষুধ ব্যবহার প্রসঙ্গে মানুষকে শিক্ষিত করা হয় নি। তৃতীয়তঃ মানুষ তাদের সন্তান-সন্ততিদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই খুবই গুরুত্ব দেন। এইকারণে দোষী ভেবে স্কুলের মাস্টারদের তার পিটিয়ে দিয়েছেন। চতুর্থতঃ নিঃশর্তভাবে সরকারের কোন কাজ মানুষ বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসের যে চিত্র দেখেন তা আপাত, না হলে হাজার হাজার মানুষ হাসপাতালে ছুটে আসতেন না আতঙ্ক, বিভ্রান্তি নিয়ে।

বি. ম ঃ ঘটনাটা ঠিক কি ঘটেছিল?

ডঃ স্বপন জানা ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রোগ্রাম হিসাবে জাতীয় কৃমিনাশক দিবসের অঙ্গ হিসাবে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। জনতাকে শিক্ষিত না করে এটা করা যায় না। এখন উচ্চমাধ্যমিকে রসায়নের সিলেবাসে ওষুধ বিজ্ঞানের বিষয় রয়েছে। আমাদের মত হল মাধ্যমিক স্তর থেকেই এটা শেখানো যায়। আমরা এটা করেও দেখিছি। এটা যদি করা যায় তবে সাধারণ মানুষ নিজেরাই এর মোকাবিলা করতে পারতেন। তাহলে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন না।

বি. ম ঃ সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার ব্যাপারটা কি রকম?

ডঃ স্বপন জানা ঃ মানুষকে শেখানো হয়নি বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং তার কারণ। ওষুধ খেয়ে গা বমি ভাব, চুলকানি, ঘুম ঘুম ভাব ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় এবং কেন তা তো তাদের শেখানো হয়নি। তার জন্য ম্যানপাওয়ার ছিল, ছিল না দায়বদ্ধতা।

বি. ম ঃ কৃমির ওষুধ অ্যালবেন্ডতাজলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুদের ক্ষেত্রে কতখানি বিপজ্জনক?

ডঃ স্বপন জানা ঃ কারও কারও হতে পারে। তবে এটা অত্যন্ত নিরীহ ওষুধ। হাজার হাজার শিশুর হওয়াটা মাস হিস্টিরিয়ার প্রভাব।

বি. ম ঃ আজকের কাগজে অনেক ডাক্তারবাবুরা লিখেছেন অ্যালবেন্ডাজলে এমনটা হওয়ার কথা নয়, তবে...?

ডঃ হীরালাল কোনার ঃ অ্যালবেন্ডাজল সত্যই একটা নিরীহ ড্রাগ। কয়েকজন বাচ্চা অসুস্থ হয়েছে ঠিকই, তবে বাকিটা 'গণেশের দুধ খাওয়ার' মত ব্যাপার।

বি. ম ঃ গণেশের দুধ খাওয়া?

ডঃ স্বপন জানা ঃ হ্যাঁ ঠিক তাই। আসলে অনেক বাচ্চার বাবা-মা বাচ্চাদের ওষুধ খেতে বারণ করেন। কিছু স্কুলে মাস্টার মশাইরা তাই মিড ডে মিলের আগে বাচ্চাদের বলেছেন ওষুধ

না খেলে খাবার পাবে না। এভাবে খালি পেটে ওষুধ খেয়ে কিছু বাচ্চাদের পাশ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে বমি বমি ভাব বা ঝিমুনি আসতে পারে। তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। আর বাবা-মা এবং অন্য বাচ্চারা তা দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একজন দেখেছে 'গণেশকে দুধ খেতে' ব্যস সকলেই গণেশকে দুধ খেতে দেখেছেন। শিক্ষার অভাব। এরজন্য মানুষ দায়ী নয়। ওষুধ পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। ওষুধটা রাতে খাবার পর খাওয়ানো উচিৎ। সকালে খালি পেটে খেয়ে অনেকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়েছে।

বি. ম ঃ মিডিয়া তো খুব...

ডঃ হীরালাল কোনার ঃ মিডিয়া আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এর জন্য হাসপাতালে বাচ্চাদের স্যালাইন, ওষুধ এসব দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কাউকে একটু বুঝিয়ে, একটু আদর করে, মনের আতঙ্ক দূর করে ছেড়ে দিতে হত। আসলে ভোট আসছে তো! তাই একদল আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে আর অন্যদল স্যালাইন, ওষুধ দিয়ে মন জয় করতে চাইছে।

বি. ম ঃ আচ্ছা 'জাতীয় কৃমিনাশক দিবস' বা 'বিশ্ব কৃমিনাশক দিবস' এর উদ্দেশ্য কী?

ডঃ হীরালাল কোনার ঃ এটা বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থার কর্মসূচী। হু-র মতে শরীরের কৃমি মেরে হিমোগ্লোবিন বাড়িয়ে অপুষ্টি দূর করা যায়। তাই এই দিবস পালন। সকল শিশুকে কৃমির ওষুধ খাওয়াও।

বি. ম ঃ এটা কি বিজ্ঞান সম্মত?

ডঃ স্বপন জানা ঃ ঠিক ধরেছেন! আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? অর্ধাহার–অনাহার যে অপুষ্টির আসল কারণ সে সব ঢাকার একটা কি সুন্দর প্রচেষ্টা!

এই ঘটনা থেকে কতগুলি শিক্ষা এবং জনসাধারণের দাবি উঠে এসেছে। শুধু কৃমির ওষুধ নয়, নানান টীকাকরণ কর্মসূচী এবং গণচিকিৎসার ক্ষেত্রে আজকাল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ইত্যাদিদের দিয়ে ডাক্তার ছাড়া তা করা হচ্ছে। অ্যালবেন্ডাজল যতই নিরীহ ওষুধই হোক তা একটি ড্রাগ যার কয়েকটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে এবং সেবনের বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে। সাধারণ জ্বরের ওষুধ থেকে কৃমির ওষুধ কোন ওষুধই ডাক্তারের উপস্থিতি বা পরামর্শ ছাড়া কাউকে খাওয়ানো উচিৎ নয়। যেভাবে এই ওষুধ স্কুলে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মানুষদের দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তা অবৈজ্ঞানিক। যে কোন ড্রাগ সেবন করানোর কর্মসূচীতে কোন চিকিৎসকের উপস্থিতি ও পরামর্শমত তা করাতে হবে, অন্য কাউকে দিয়ে ছেলেখেলা করানো চলবে না। এটাই মানুষের বিজ্ঞান সম্মত দাবি। এই পদ্ধতিতে চললে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোধ করা যেত, আতঙ্ক ছড়াতো না। ■

মাদার টেরেসার সেন্টহুড প্রাপ্তি!

গত ১৮ই ডিসেম্বর ভ্যাটিকান সিটি থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ২০১৬ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে মাদার টেরেসাকে 'সেন্টহুড' দেওয়া হবে। অর্থাৎ ঐ দিন থেকে তিনি হবেন 'সেন্ট-টেরেসা'।

মাদার টেরেসা Skopje শহরের ম্যাসিডোনিয়ায় ২৬শে আগস্ট ১৯১০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। মাদার টেরেসা হবার আগে তার নাম ছিল – অ্যাঞ্জেজি গোনস্কহি বোজাক্সহিউ। তিনি একজন রোমান ক্যাথলিক নার্স ছিলেন। প্রথমে তিনি অ্যায়ার ল্যান্ড ও পরে ভারতে চলে আসেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ভারতে কাটান। তিনি মিশনারিস্ অফ চ্যারিটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৯ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। এছাড়া তিনি ভারত-রত্ন সহ আরও অনেক পুরস্কার পান। ১৯৯৭ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মারা যান।

মাদার টেরেসার মৃত্যুর ২ বছরের মধ্যে তাকে সেন্ট অভিধা দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করেন পোপ দ্বিতীয় সেন্ট জন পল স্বয়ং, যা ভ্যাটিকানের নিয়মে পড়ে না। সাধারণতঃ মৃত্যুর ৫ বছর পর থেকে সেন্ট উপাধি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সেন্ট উপাধি পেতে গেলে দুটি অলৌকিকত্ব বা মিরাক্যালের প্রমাণ প্রয়োজন হয়। প্রথমটি বিঅ্যাটিফিকেশনের মাধ্যমে 'ব্লেসড' ঘোষণা ও দ্বিতীয়টি 'ক্যাননাইজেশন' বা সন্তকরণ।

ভ্যাটিকানের মতে মাদার টেরেসা প্রথম মিরাক্যাল ঘটান ১৯৯৮ সালে অর্থাৎ তার মৃত্যুর ঠিক এক বছর পরে পশ্চিম দিনাজপুরের হরিরামপুর এলাকার দানবগ্রামের এক আদিবাসী মহিলা, মনিকা বেসরার তলপেটের টিউমার সারিয়ে। মনিকা বেসরা সাওতাঁলি ভাষায় সেসময় জানান যে – দীর্ঘদিন ধরে তিনি তলপেটে টিউমারের কারণে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছিলেন।

তারপর একদিন মাদার টেরেসার ছবি তলপেটে রাখতেই তার ব্যাথা দূর হয় এবং টিউমার সেরে যায়। যদিও তার স্বামী সিকু মুর্মু জানান যে – এই ব্যাথার জন্য দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে মনিকার চিকিৎসা চলছিল, এবং ডাক্তারের ওষুধেই তার স্ত্রী সুস্থ হয়েছেন।

যে ডাক্তার মনিকার চিকিৎসা করেছিলেন সেই ডা. রঞ্জনা মুস্তাফি জানান যে – টিউমার নয়, মনিকা ভুগছিলেন ডিম্বাশয়ের যক্ষা রোগে। আর টানা এক-বছরের মতো তিনি ওষুধ খেয়েছিলেন। এবং ডাক্তারী চিকিৎসার মাধ্যমেই তিনি সুস্থ হয়েছেন, এবং মনিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পাঠান হয়েছে।

ডাক্তারি চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে ভ্যাটিকান সিটি এটিকে মাদার টেরেসার মৃত্যুর পর অলৌকিকত্বের প্রমাণ বা মির‍্যাকাল বলে ঘোষণা করে এবং পোপ পল তাকে ব্লেসড ঘোষণা করেন।

মাদার-টেরেসার সেন্ট হবার কথা শুনে মনিকা বেসরা আপেক্ষ করে বলেন যে, চার্চ তাকে অনেক কিছু দেবে বলেছিল। তবে এখনো অবধি কিছুই দেয়নি।

এবার আসা যাক তার দ্বিতীয় মির‍্যাকালের ব্যাপারে। ২০০৮ সালে ব্রাজিলের স্যান্টোসে মস্তিষ্কে একাধিক টিউমার নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এক ব্যক্তি। তার স্ত্রী ঐ বছরের মার্চ মাস থেকেই স্বামীর আরোগ্যের জন্য রোজ মাদারের কাছে প্রার্থনা শুরু করেন। ৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যে ৬টায় ডাক্তাররা তার অপারেশন শুরু করবেন বলে ঠিক করেন। ঐ সময় তার স্ত্রী-ও প্রার্থনায় বসেন। পরে ডাক্তাররা এসে নাকি দেখেন রোগী পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে এবং অস্ত্রপচারের আর কোন প্রয়োজনই নেই, এবং ডাক্তাররা এক সময় বলেছিলেন ঐ ব্যক্তির ভবিষ্যতে পিতা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি দুই সন্তানের পিতাও হন।

এই অসম্ভব দুটি মির‍্যাকলের জন্য ভ্যাটিক্যান তাকে 'সেন্ট' ঘোষণা করেন। তবে দ্বিতীয় মির‍্যাকলের ব্যাপারে প্রথম বারের মত ভুল করেনি ভ্যাটিক্যান। অর্থাৎ মনিকা বেসরার মত নাম-ধাম তারা প্রকাশ করেনি। দ্বিতীয় মির‍্যাকলের কেন্দ্র-বিন্দুর ব্যক্তিটির পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। হয়ত এখনো নাম ঘোষণার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি তৈরী করা যায় নি বলে!

যাই হোক এতো গেলো মাদারের সেন্টহুডের ব্যাপার। এবার একটু জানা যাক মাদারের নিজস্ব কিছু চিন্তা-ধারা ও মতামতের ব্যাপারে।

মাদার টেরেসা বিশ্বাস করতেন – যে কোন দুর্ভোগই- অর্থাৎ তা দারিদ্র, অনাহার, রোগ-ভোগ যাই হোক না কেন, এগুলি হচ্ছে আসলে ভগবানের আশীর্বাদ। সমালোচকরা এক্ষেত্রে বলেন – তাহলে তিনি বিলিয়ন ডলারের চ্যারিটি হাউস খুলে বসেছেন কেন ? তার ১০০ মিলিয়ন ডলারের (যা ডোনেশনের মাধ্যমে আদায় হয়) সম্পত্তির অধিকারী মিশনারি অফ চ্যারিটি তার সম্পত্তি থেকে মাত্র ৫-৭% খরচা করেছে গরীব-দুক্ষীদের দুঃখ দূর করতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটর (যা কিনা ভারতের পর্যটন মন্ত্রকের একটি সংস্থা) এর কর্তা সুভাষ গোয়েল গত ৫ই জানুয়ারি তার দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন যে রাজ্য সরকার ভ্যাটিকান সিটির এই ঘোষণাকে যেন পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজে লাগায়। শ্রী গোয়েল মন্তব্য করেন "আমি দেখেছি বহু ইউরোপীয় রাষ্ট্র তাদের দেশে সেইন্টহুড প্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের উর্ধ্বে তুলে ধরে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে যদিও তারা তেমন জনপ্রিয় নন। ... উচিত রাজ্য সরকারের সাথে যৌথভাবে মাদার টেরিজার অলৌকিকত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরা এখানকার পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য।"

সুতরাং পচনশীল পুঁজিবাদী সমাজে অলৌকিকত্ব শুধু সমাজকে অন্ধকারে রাখার কাজ করে তাই নয়, তা এক মহাপণ্যও বটে!

দুনিয়ার পুঁজিপতিশ্রেণী মাদার টেরেসাকে সর্বদা মাথায় করে রেখেছে কারণ সমাজের শোষণ বঞ্চনাকে ন্যায্যতা দানে তার অবদান বিশাল ছিল। এই জন্য তাঁকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম ও সংঘর্ষকে মাদার ঘৃণা করতেন এবং শোষিত মানুষকে বোঝাতেন তাদের এই অবস্থাও ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তিনি সবসময় সমস্তরকম ধর্মঘট-আন্দোলনের বিরোধিতা করতেন বলে পুঁজিপতিশ্রেণী সবসময় তার পূজা করে এসেছে। ভারত সরকার তাকে ভারত রত্ন বলে ঘোষণাও করেছে।

শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাক্ স্বাধীনতায় তাঁর আপত্তি ছিল এবং ১৯৭৫ সালে দেশে জারি হওয়া জরুরী অবস্থারও তিনি সমর্থক ছিলেন।

সারা জীবন শোষকশ্রেণীর সেবায় আত্মনিবেদিত মাদার টেরেসার ঈশ্বরপ্রাপ্তি তাই ন্যায্যতাই দাবি করে!■

মাইল ফলক আবিষ্কার

অবশেষে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান মিলল

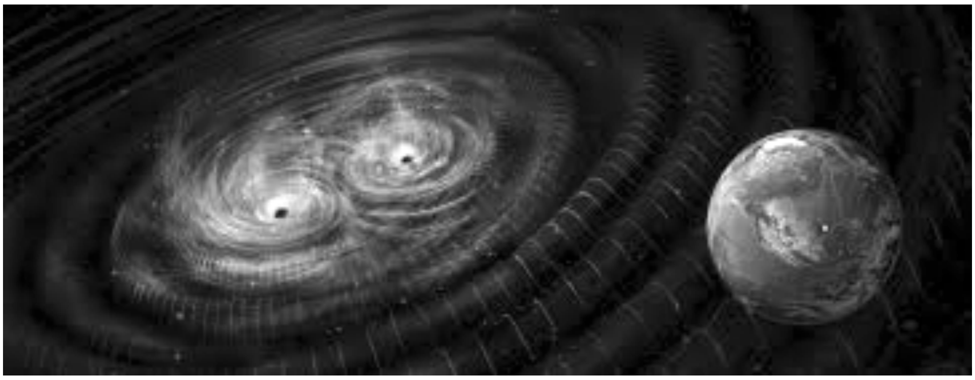

২০১৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি একটা গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, যাতে বলা হলো – বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত দুটো কৃষ্ণগহ্বরকে ঝগড়া (সংঘর্ষ) করতে দেখেছেন, এরপর আবার মিলেমিশে (একীভূত হয়ে) যেতে দেখেছেন, এবং এই ঘটনা থেকে পেয়েছেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান, যে তরঙ্গকে বরাবর ১০০ বছর ধরে খুঁজছিলেন পদার্থবিদেরা। আমাদের মহাবিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল মাইলফলক। কেন এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ, সেই ব্যাপারে যথাসময়ে আসছি। তবে তার আগেই প্রাথমিক জ্ঞানগুলো সহজ ভাষায় বলে নেওয়া দরকার। আমাদেরকে শুরুতেই জানতে হবে মহাকর্ষ কী। এটা নিয়ে ভালো করে না জানলে ঐ তরঙ্গের মা-বাপের খবর পাওয়া যাবে না। সেটা জেনে নিয়ে দেখবো তরঙ্গটা কী; এরপর দেখবো কেমনে মানুষ মহাজাগতিক গোয়েন্দার মত "হ্যানডস্ আপ" বলে ওকে সনাক্ত করে ফেললো। আসুন, শুরু করি ...

মহাকর্ষ কী?

অত্যন্ত সংক্ষেপে – নিউটন বলেছিলেন, সবকিছু একে অপরকে আকর্ষণ করছে, এবং এই আকর্ষণ বল হচ্ছে মহাকর্ষ। এই মহাকর্ষ বলের মাধ্যমেই সূর্য পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলোকে বলছে, "আমার চারপাশে ঘোর, ব্যাটা।" কিন্তু কিভাবে, সেটা তিনি জানতেন না। আইনস্টাইন এসে বললেন, আসলে আকর্ষণের জন্য নয়, মহাকর্ষ কাজ করে আরেকটু ভিন্নভাবে। কিভাবে? সংক্ষেপে, মহাকর্ষ হচ্ছে "স্থান-কাল চাদরের মধ্যে একটা বক্রতার প্রভাব"। এই ৭টা শব্দ প্রত্যেকটা আলাদ করে বুঝলেও একত্র করলে অনেকেরই বুঝতে বেশ সমস্যা হয়। তাই আসুন, জিনিসটাকে আরেকটু ভালো করে দেখি।

স্থান বলতে আমরা (ত্রিমাত্রিক প্রাণীরা) যা বুঝি, তা হলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমন্বয়। এই তিনটি জিনিস আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এবং এগুলোতে আমাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণও করতে পারি। মানে, আমরা সামনে-পিছনে (দৈর্ঘ্য) ডানে-বামে (প্রস্থ), আর উপরে-নিচে (উচ্চতা) নড়াচড়া করতে পারি। আইনস্টাইনের মতে সময়ও এখানে আরেকটি মাত্রা হিসেবে কাজ করে। তিনটি মাত্রার স্থান আর আরেক মাত্রা সময়, দুটো মিলিয়ে চতুর্মাত্রিক পর্দা তৈরি হয়, যার নাম স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম (Space-Time Continuum) বা স্থান-

স্থান-কালের চাদরে বক্রতা

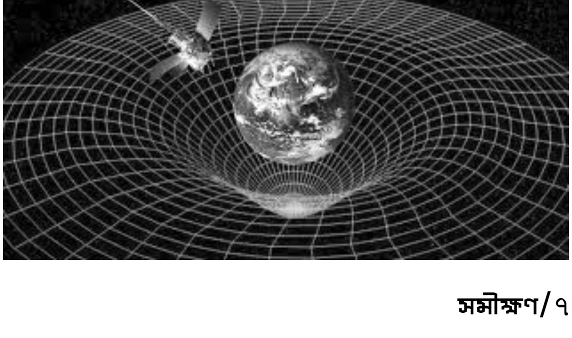

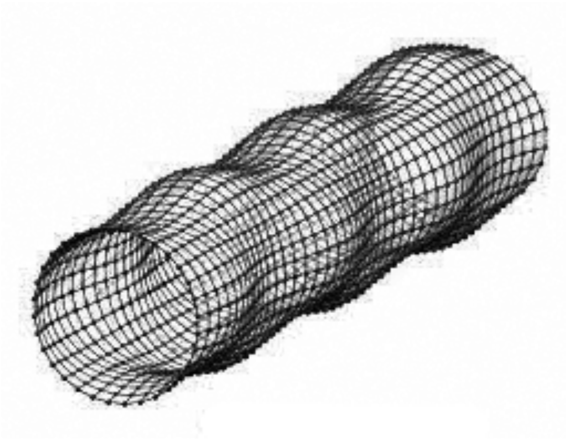

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ত্রিমাত্রিক চিত্র

কালের চাদর। আমরা ত্রিমাত্রিক প্রাণী, আমাদের জন্য চারটি বস্তুগত মাত্রা কল্পনা করা অত্যধিক কঠিন। তাই, আসুন আমরা ত্রিমাত্রিকভাবেই চিন্তা করি।

মনে করুন, একটি বিশাল এবং মোটা কাপড়ের পর্দাকে টানটান করে ঘরের চারকোণার খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। ধরুন, এই চাদরটা হচ্ছে স্থান-কালের চাদর। এখানে আপনি যত ভারী বস্তু রাখবেন, তত বেশি বক্রতা তৈরি হবে। আর এই বাঁকের মধ্যে যারা আসে, তারা সেই বাঁকে আটকে যাবে অর্থাৎ, বক্রতার কারণে এখন যা যা ঘটবে, সেটাকেই আমরা মহাকর্ষ বলি। এখন, কম ভরের বস্তুগুলো বেশি ভরের বস্তুর চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরা শুরু করবে। আর এভাবেই মহাকর্ষ কাজ করে, কোনো আকর্ষণের বালাই নেই। আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলেন।

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কী?

সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে থাকতে যে জিনিস পড়েছিলাম, সেখান থেকে ঘুরে আসি। তরঙ্গের ব্যাপারে দেখেছিলাম, সেটা নাকি দুই প্রকার –

১) অনুদৈর্ঘ তরঙ্গ বা longitudinal wave – যেটা এগিয়ে যায় সংকোচন আর প্রসারণের মাধ্যমে। যেমন শব্দ।

২) অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা transverse wave – যেটা এগিয়ে যায় শীর্ষ এবং খাদের মাধ্যমে। যেমন আলোর তরঙ্গ রূপ, তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ, জলের তরঙ্গ ইত্যাদি।

এই অনুপ্রস্থে শুধু একটি মাত্রা (উচ্চতায়) নড়াচড়ার ফলে তরঙ্গটা আরেকটি মাত্রায় (দৈর্ঘ্যে) এগিয়ে যাচ্ছে। এই দুটো তরঙ্গ দ্বিমাত্রিক তলে দেখানো গেলেও মহাকর্ষীয় তরঙ্গের জন্য ত্রিমাত্রিক চিত্রটা প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে সংকোচন-প্রসারণ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দুটো মাত্রায়, একই সাথে প্রস্থে এবং উচ্চতায়। যখন এই তরঙ্গে কোনোকিছুর মধ্য দিয়ে যাবে, তখন সেই জিনিসটাও এভাবে মুচড়ে যাবে। মোচড়ানোর পরিমাণ অত্যধিক সামান্য। এতো সামান্য যে সেটা সনাক্ত করার জন্য আমাদেরকে প্রায় ১০০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এতোদিন আমাদের সেই যান্ত্রিক সক্ষমতাই ছিলো না। এবং এভাবেই এই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে স্থান-কালের চাদরে, আলোর গতিতে। আমরা জানলাম যে, যে কোনো বস্তুই স্থান-কালের চাদরে বক্রতা তৈরি করে। আর এভাবেই মহাকর্ষ তৈরি হয়। যখন ভরযুক্ত বস্তু স্থান-কালের চাদরে ভেসে বেড়ায়, তখন এই বক্রতার প্রভাবও কিন্তু সেই বস্তুর সাথে সাথে চলতে থাকে – "তুমি যেখানে, আমি সেখানে" স্টাইলে। কিন্তু কখনো কখনো, কোনো বস্তুর ত্বরণ বা গতিবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। কিভাবে বেড়ে যায়? যখন একটা বিশাল ভরের বস্তু আরেকটা বিশাল ভরের কাছাকাছি আসে। যেমন দুটো কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাক হোল), একটা কৃষ্ণগহ্বর এবং একটা বিশালাকার নক্ষত্র, ইত্যাদি। একটা আরেকটার বক্রতার মধ্যে আটকা পড়ে যায়। পাইরেটস অফ ক্যারিবিয়ানের শেষ দিকে যে দুটো জাহাজের যুদ্ধ হয়, মনে আছে? তেমন করে একজন আরেকজনকে চক্কর খেতে থাকে, ত্বরণও বাড়তে থাকে। যাই হোক, ত্বরণ বেড়ে গেলে স্থান-কালের ঐ চাদরে একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, যা ঢেউ আকারে আলোর গতিতে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউকেই বলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ)। প্রথমবারের মত দুটো কৃষ্ণগহ্বরকে এই কাহিনীর মত কাজ করতে দেখেছি আমরা। কিভাবে এটা সনাক্ত করা হলো?

লিগো (LIGO - Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) এই জিনিসটা শেষ পর্যন্ত সনাক্ত/আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিভাবে? গল্পটা কোনো খুনের রহস্য সমাধানের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়।

১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে, অর্থাৎ ১২৩০ ট্রিলিয়ন মাইলের মত বিশাল এক দূরত্বে দুটো কৃষ্ণগহ্বর একটা আরেকটার সাথে সংঘর্ষ করে একীভূত হয়ে গেলো। দুই কালো গহ্বরের একটার ভর ছিলো আমাদের সূর্যের ২৯ গুণ, অন্যটা ৩৬ গুণ। সূর্যের ভর চিন্তা করলেই খাবি খেতে হয়। সূর্য আয়তনে অনেক বড় একটা জিনিস, এটাতে অনেক ভর ধরে।

সেটার ভরকে ২৯ আর ৩৬ দিয়ে মনে মনে গুণ দিন। এবার চিন্তা করুন, সেই ভরের দুটো জিনিস (যদিও আয়তনে অনেক ছোটো, কম জায়গায় বেশি বস্তু নিয়ে চলে কৃষ্ণগহ্বর) সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।

সংঘর্ষে দুটো মিলে একটি কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হলো, যার ভর দাঁড়ালো আমাদের সূর্যের ৬২ গুণ, বাকি ৩ গুণ ভর শক্তিতে পরিণত হলো। এই সংঘর্ষের ঘটনাটা স্থান-কালের চাদরে বইয়ে দিলো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ আলোর গতিতে, অর্থাৎ ১৩০ কোটি বছর সময় অতিক্রম করে এসে পৌঁছালো পৃথিবীতে। এ ধরনের ঘটনাগুলো থেকে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বের হয়, তা আইনস্টাইনই প্রস্তাব করেছিলেন ১৯১৬ সালে। এরপর থেকে চলছিলো সনাক্ত করার চেষ্টা। আমরা জানি, এই তরঙ্গ স্থান-কালকে মুচড়ে দেবে। অর্থাৎ পৃথিবীতেও আমরা স্থান দেখি, সেই স্থানের সংকোচন-প্রসারণ ঘটবে। আমরা সেই সংকোচন-প্রসারণ বুঝবো না, কারণ সেটা খুব সামান্য।

আর মাপার জটিলতাতে কাহিনী আরো একটা আছে। মনে করুন, আপনার কাছে একটা স্কেল আছে যেটা দিয়ে আপনি বারো ইঞ্চি মাপতে পারেন। এখন বারো ইঞ্চির দুদিকে দুটো খুঁটি পুঁতলেন। এই দুই খুঁটির মধ্যে দূরত্বটা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আসার পর বাড়লো নাকি কমলো, সেটা ঐ স্কেল দিয়ে বোঝা যাবে না। কারণ তরঙ্গের কারণে ঐ দূরত্বটা যদি বাড়ে, তাহলে স্কেলেরও ততটুকু প্রসারণ ঘটবে। আপনার কাছে তখন সেটাকে ১২ ইঞ্চিই মনে হবে। মহাবিশ্বের শুধু একটা মানদন্ডই আছে, যা এই তরঙ্গে পরিবর্তিত হবে না। শুধু সেই মানদন্ড দিয়েই আপনি সংকোচন বা প্রসারণ মাপতে পারবেন। সেই মানদন্ড হচ্ছে আলো। আলোর গতি একই থাকবে, এবং আলোর যাওয়া-আসার সময় দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন দূরত্ব কতটুকু। ধরুন, আগে স্থান-১ থেকে স্থান-২ পর্যন্ত যেতে যদি আলোর ০.০০১ সেকেন্ড সময় লাগতো, দূরত্বটা প্রসারিত হলে ০.০০১ সেকেন্ডের চেয়ে একটু বেশি লাগবে।

দৃশ্যপটে এলো লিগো। চার কিলোমিটার লম্বা ইংরেজি L আকৃতির সুরঙ্গ বানালো ওরা। সুড়ঙ্গের এক মাথা থেকে অরেক মাথায় ওরা আলো (লেজার) ছুঁড়ে মারে। এরপর অন্য মাথায় গিয়ে সেটা ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগে, সেটা বিচার করে দেখে যে আসলেই দূরত্বটা এখনো ৪ কিলোমিটারই আছে কিনা। যদি সময় কমবেশি লাগে, তাহলেই বোঝা যাবে যে স্থান মুচড়ে গেছে, সংকোচন-প্রসারণ হচ্ছে। এক মাত্রায় (ধরুন ডানে-বামে) যদি প্রসারিত হয়, তাহলে অন্য মাত্রায় (সামনে-পিছনে) সংকুচিত হবে। অর্থাৎ L এর এক বাহুতে আলো যেতে বেশি সময় নেবে, আরেক বাহুতে আলো যেতে কম সময় নেবে। দুটোই মিলতে হবে।

৮ কিমি লম্বা L আকৃতির LIGO

কতটুকু সংকোচন/প্রসারণ হয়েছিলো? একটা প্রোটনকে ১০ হাজার ভাগে ভাগ করলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, ততটুকু পরিমাণ দৈর্ঘ্যের পার্থক্য যদি আপনি মাপতে পারেন, তাহলে আপনি এই সংকোচন আর প্রসারণ মাপতে পারবেন। বোঝা গেল না মনে হয়? আরেকটা উদাহরণ দেই – ধরুন, আপনার কাছে ১ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার লম্বা একটা ট্রেন আছে। সেটার মধ্যে যদি মাত্র ৫ মিটার লম্বা আরেকটা বগি লাগাতে হয়, তাহলে দৈর্ঘ্যের যেমন পার্থক্য হবে, সেটা আপনাকে মাপতে পারতে হবে। অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র ছাড়া এই পার্থক্য মাপা সম্ভব নয়।

মাপার মধ্যে আরেকটা সমস্যা তো ছিলোই, সেটা হলো হৈচৈ। যে কোনো জিনিস, যার আয়তন আছে, অথবা যার তাপমাত্রা পরম শূন্য তাপমাত্রার ওপরে, সেটাই কাঁপে,সর্বদাই কাঁপছে। এগুলোকে যন্ত্রের হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে। তারপর অন্যান্য তরঙ্গ আছে, সেগুলোকেও বাদ দিতে হবে। তার ওপর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এইরকম কাকতালীয় ঘটনা ঘটলো কিনা, তাও দেখতে হবে। তাই, এই ধরনের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বানানো হলো দুটো। একটা যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানাতে, আরেকটা চার হাজার কিলোমিটার দূরে ওয়াশিংটনে। নিশ্চিত হবার জন্য দুটো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের একই পরিমাপ পেতে হবে।

২০০২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত লিগো'র তথ্য সংগ্রহের প্রথম অধিবেশন চললো। কিন্তু ওরা কোনো ফলাফল পায়নি। আগেই বলেছি, কাজটা কঠিন। এরপর ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত

ওরা অনেক যান্ত্রিক ত্রুটি সারালো। এই ত্রুটি সারাতে, সংবেদনশীলতা বাড়াতে, ৫ বছরে খরচ হয়েছিলো প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার। ২০১৫-এ যখন তথ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হলো, তখন ওরা প্রায় সাথে সাথেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছিলো। কিন্তু সেটা আসলেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ কিনা, সেটা নিয়ে বারবার পরীক্ষা চলতে লাগলো। অবশেষে ২০১৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে ওরা নিশ্চিতভাবেই এই কৃষ্ণগহ্বর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। শুরু হলো গবেষণা প্রবন্ধ লেখার কাজ। গবেষকদের বিশাল একটা দল ফিজিকাল রিভিউ নামক গবেষণা পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ জমা দিলো ২০১৬ সালের জানুয়ারির ২১ তারিখে। সেই প্রবন্ধ প্রকাশনার জন্য নির্বাচিত হলো ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ। সেই প্রবন্ধে একটা রেখাচিত্র (গ্রাফ) আছে, যেখানে দুই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রতেই একই ফলাফল পাওয়ার ব্যাপারটা দেখানো হয়েছে। এই তরঙ্গ আবিষ্কার হওয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

প্রত্যেকটা তরঙ্গ আমাদেরকে নতুন কিছু শেখায়। প্রথমে আমরা শুধুমাত্র চোখের দেখাতে যা যা দেখা যায়, তাই দেখতাম। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো ধরা পড়ে, সেই দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গেই দেখতাম। এরপর যখন অবলোহিত (ইনফ্রারেড), অতিবেগুনী (আলট্রাভয়োলেট), বেতার (রেডিও) এমন তরঙ্গগুলো আবিষ্কৃত হলো, আমাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে গেলো। আর সেগুলোর প্রভাব নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না। আর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তো একেবারে আলাদা এক ধরনের তরঙ্গ। এই তরঙ্গ ব্যবহার করে যে সামনে আমরা কী কী দেখবো, তা এখন অনুমানও হয়তো করা যাচ্ছে না। একদম কম করে বললেও, আমরা বুঝতে পারবো – আমাদের এই মহাবিশ্ব কিভাবে কাজ করে, মহাকর্ষ কিভাবে কাজ করে। এটা জন্ম দিয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার একদম নতুন একটা শাখা। হয়তো একদিন এটার মাধ্যমেই আমরা মহাকর্ষকে কাজে লাগাতে শিখবো। মহাকর্ষকে যদি কাজে লাগানো যায়, কোনোভাবে যদি স্থান-কাল চাদরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায়, তাহলে কী হবে, আন্দাজ করতে পারছেন? হয়তো আমরা ওয়ারমহোল বা কীটগহ্বর তৈরি করতে পারবো, আলোকবর্ষ ভ্রমণ করতে পারবো মুহূর্তের হিসেবে।

স্টিফেন হকিং একটা মন্তব্য করেছেন এই আবিষ্কারটি প্রকাশিত হওয়ার পর। তিনি বলেছেন বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রাকে পাল্টে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই ধরনের বিশাল আবিষ্কার আমাদের জীবদ্দশায় আবার হবে কিনা, তা বলা বেশ মুশকিল। এটাই হয়তো আপনার আর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান ভিত্তিক মুহূর্ত – এতোটাই বিশাল এই আবিষ্কার। ■

●৩৪ *পৃষ্ঠার পর*

বিজ্ঞানের খবর

যে মানুষ বাঁধ নির্মাণ ও সেচের ব্যবহার শুরু করেছিল অতীতে যেরকম ধারণা করা হত তার অনেক আগে। (সায়েন্স ডেইলি)

৭.●জাপানের কৃত্রিম উপগ্রহ আকাতসুকি শুক্র গ্রহের কক্ষপথে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ২০১০ সালের প্রথম পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়েছিল। (সায়েন্স ডেইলি)

●এইনধোভেন কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের ক্ষুদ্রতম টেম্পারেচার সেন্সর আবিষ্কার করেছে যাকে শক্তি প্রদান করা হবে রেডিও ওয়েভের সাহায্যে। (রিট্রাইভড্)

৯.●বহু প্রয়াসের পর বিশ্বে সর্বপ্রথম টেসটিউবে কুকুরের বাচ্চার জন্ম দিল মার্কিন বিজ্ঞানীরা। (বিবিসি)

১১.● পুরাজীববিদরা **হুয়ালিয়ানসেরাটপস উকাইওয়ানেনসিস** নামক এক শাকাহারি সেরাটোপসিয়ান ডাইনোসরের আবিষ্কার করল যারা ১৬ কোটি বছর আগে পশ্চিম চীনে বসবাস করত। (রিট্রাইভড্)

১৪.● এম আই টি'র গবেষকরা একপ্রকার নতুন অ্যানাটোমিক ফোরস মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে ২০০০ গুণ দ্রুতবেগে ছবি স্ক্যানিং করা সম্ভব হবে। (এম আই টি)

১৫.●সার্নে স্বাধীনভাবে গবেষণারত দুটি পদার্থবিজ্ঞানীদের দল পৃথকভাবে একটি নতুন সাব অ্যাটমিক কণার সম্ভবত সন্ধান পেয়েছেন। যদি এটি সত্য হয় তবে তা হিগস বোসনের তুলনায় ভারি কণা গ্রাভিটন। (রিট্রাইভড্)

২৮.●বিজ্ঞানীরা চাঁদের ভূত্বকে একপ্রকার ব্যাসল্ট জাতীয় নতুন পাথরের সন্ধান পেয়েছেন যাতে ইলমেনাইট ($FeTiO_2$) খনিজের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। চীনা স্পেসক্রাফ্ট ২০১৩তে চাঁদে যে গবেষণা চালাচ্ছে এই তথ্য তা থেকে জানা গেল। (রিট্রাইভড্)

৩০.●পিরিয়ডিক টেবিলের সপ্তম সারণীর সম্পূর্ণ খোঁজ মিলেছে বলে ঘোষণা করা হল। যাদের পারমাণবিক সংখ্যা ১১৩, ১১৫, ১১৭ এবং ১১৮ সেই মৌলগুলির খোঁজ মেলায় এই কাজ সম্পূর্ণ হল। (সায়েন্স ডেইলি) ■

মহাকাশ বিজ্ঞানের সাধারণ পরিচয়

মহাকাশের অনুসন্ধানে

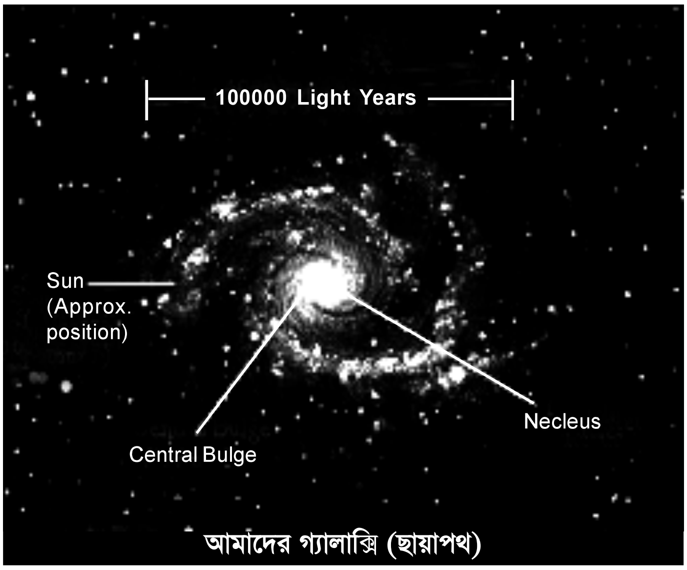

আমাদের গ্যালাক্সি (ছায়াপথ)

মেঘমুক্ত রাতের আকাশের দিকে যখন তাকাই – বিস্ময় জাগে। অসংখ্য তারার আলোকবিন্দু। কোনোটি উজ্জ্বল, কোনটি আবার মিটমিটে। আমাদের সূর্যও নাকি এমনই একটি তারা। আকারে তাও মাঝারি মানের। আর সূর্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন (আটটি/নয়টি) গ্রহ ঘুরছে। তার একটি হল পৃথিবী; আমাদের প্রিয় বাসভূমি। পৃথিবীর একটি উপগ্রহও আছে। ঐ যে নয়নাভিরাম চাঁদ! অন্যান্য গ্রহেরও বিভিন্ন উপগ্রহ আছে। মোটামুটি এই নিয়ে আমাদের ছোট্ট পরিবার-সৌরমন্ডল। তাহলে ঐ যে অসংখ্য তারারা – ওদেরও এমন ছোট্ট ছোট্ট পরিবার আছে? হ্যাঁ ঠিক তাই। এভাবে অসংখ্য তারাদের পরিবার নিয়ে বৃহত্তর পরিবার – যার নাম গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। আমাদের গ্যালাক্সির নাম **মিলকিওয়ে**। এটি সর্পিলাকার। সূর্য তার একটা সর্পিল বাহুর ধারের দিকে অবস্থান করে গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল সাপেক্ষে ঘুরছে।

এভাবে অসংখ্য গ্যালাক্সিদের নিয়ে গ্যালাক্সিপুঞ্জ – আরও বৃহত্তর পরিবার। এভাবে একটা গ্যালাক্সিপুঞ্জ থেকে অন্য একটি গ্যালাক্সিপুঞ্জ কত দূরে? কোটি কোটি কিলোমিটার? সংখ্যাটা তার থেকেও ঢের ঢের বড়; এত বড় যে ওটা প্রকাশ করতে গিয়েই একটা হিজিবিজি ব্যাপার হয়ে যায়। তাই জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা একটা উপায় বের করেছেন। আলোকসময়। দূরের একটা তারা থেকে আলো আসতে যে সময় লাগে, তারাটির দূরত্ব তত আলোক সময়। যেমন – সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে। তাই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৮ আলোক মিনিট। আমাদের কাছের একটি গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রেডিমার দূরত্ব ২২ লক্ষ ৫০ হাজার আলোকবর্ষ। তাহলে একবার ভাবুনতো – আমরা এই মুহূর্তে আকাশে যে তারাটির আলোকবিন্দু দেখছি (বহুদূরের গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিপুঞ্জকেও একটি আলোকবিন্দু বলে মনে হয়), কত দূর পথ পাড়ি দিয়ে কত লক্ষ-কোটি বছর আগের এই আলোকবিন্দু (তারা)! ইতিমধ্যে যদি তারাটির ধ্বংস বা মৃত্যু হয়েও যায়, সে খবর আমাদের কাছে থাকা সম্ভব?

হ্যাঁ, তারাদেরও মৃত্যু হয় – যেমন তাদের জন্মও আছে। কিভাবে তারাদের জন্ম হয়? রূপকথার ফিনিক্স পাখীদের মত যেন। কিন্তু রূপকথা নয় প্রতিটি গ্যালাক্সির তারাদের মাঝে কোটি কোটি মাইল জুড়ে ফাঁকা জায়গা। তাই বলে একেবারে ফাঁকা নয়। রয়েছে হাইড্রোজেন, ধুলোকনা ও অন্যান্য গ্যাসীয় কণার বিস্তৃত মেঘ। বিশাল আয়তনের জন্য ঘনত্বও খুব কম। অর্থাৎ কণাগুলি পরস্পর দূরে দূরে। ধরুন প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে দশটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু। এদের নিয়েই নিহারীকা (নেবুলাস)। ঘনত্ব কম হলে কি হবে – বিশাল আকারের জন্য গ্যালাক্সির মোট ভরের বিপুল পরিমানই এদের মধ্যে। নবজাত তারারা জ্বলে ওঠার বাসনায় এই মেঘপুঞ্জ লক্ষ লক্ষ বছর প্রতীক্ষা করে। এক সময় উপযুক্ত পরিবেশে ধুলো ও গ্যাসীয় কণাগুলি জড়ো হতে শুরু করে। এর সঠিক কারণ আজও বিজ্ঞানীদের অধরা। জড়ো হতে হতে যখন খানিকটা বড় হয় মাধ্যাকর্ষ মূল

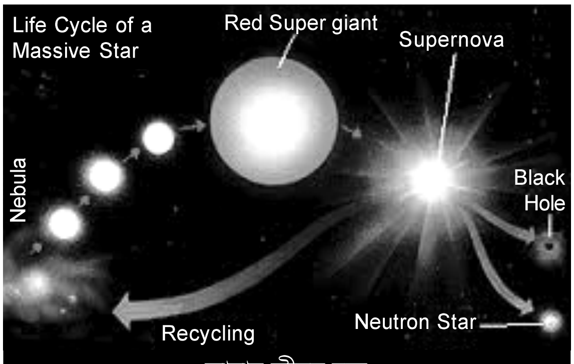

তারার জীবন চক্র

ভূমিকায় চলে আসে। কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষ টানে গ্যাসপুঞ্জটি জুড়তে থাকে। প্রবল মাধ্যাকর্ষনে একসময় এতটাই সংকুচিত হয় যে কণাগুলি খুব কাছাকাছি এসে যায় এবং ঘর্ষণে প্রচন্ড তাপ (প্রায় ১ কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট) উৎপন্ন হয়। এই তাপে প্রতি দুটি হাইড্রোজেন পরমানুর কেন্দ্রকদুটি যুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হয় (নিউক্লিয় ফিউশন)। উৎপন্ন হিলিয়াম পরমাণুটির ভর দেখা যায় – হাইড্রোজেন পরমানু দুটির মিলিত ভরের থেকে সামান্য কম। এই সামান্য পরিমান ভরই যখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেটা গিয়ে দাড়ায় বিপুল পরিমানে। আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত ভর শক্তির রূপান্তরের সূত্রই একথা আমাদেরকে জানতে দিয়েছে। $E = mc^2$ সেই সামান্য পরিমান ভরকে (m) আলোর গতিবেগের (c) বর্গের সঙ্গে গুণ করলে রূপান্তরিত শক্তি (E) পাওয়া যায়। এই পরিমানটা যে কত বিপুল – আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না। ধরুন আপনার কাছে এক কেজির কোন একটি জিনিস রয়েছে। একে যদি সম্পূর্ণরূপে আপনি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন তাহলে আপনি ২৫০০ কোটি তড়িৎ ইউনিট (B.O.T) শক্তি পাবেন। এই তড়িৎ শক্তি দিয়ে আপনার পরিবারের ১ কোটি বছরেরও বেশি দিনের তড়িৎ চাহিদা পূরণ করবে, আপনি মাসে ২০০ ইউনিট করে খরচ করলেও। যাইহোক – এভাবে লক্ষ লক্ষ টন হাইড্রোজেন পুড়ে উৎপন্ন বিপুল এই শক্তি তাপ ও আলোক বিকিরণরূপে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। আমাদের উষ্ণতা দেয়, আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

এটা অন্তত বোঝা গেল – মহাকাশে এই যে তারা জন্ম নিল – তার জ্বালানী হল হাইড্রোজেন। কিন্তু হাইড্রোজেন যখন ফুরিয়ে যাবে? ঠিকই ধরেছেন – মৃত্যু। এভাবেই তারাদের জন্ম, শৈশব থেকে নবীন, প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে বার্ধক্য এবং সবশেষে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুটাও বড় ঘাত প্রতিঘাতময়। কেউ মৃত্যুর সময় প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে চৌচির হয়ে মহাকাশে (টুকরো টুকরো আকারে) ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে (সুপারনোভা)। যে মহাকাশ থেকে জন্ম সেখানেই মিলিয়ে যায়। হয়ত প্রতীক্ষা করতে থাকে কোন নতুন তারকার জন্ম সম্ভাবনায়। কিছু তারা আবার অন্তিম কালে সংকুচিত হয়ে শ্বেত বামন তারা (হোয়াইট ডুয়ার্ফ) বা নিউট্রন তারা হয়ে মহাকাশে শোভা পায়। পালসারগুলি হল এই নিউট্রন তারা। আর কিছু তারা তাদের বিপুল ভরকে এক্কেবারে সংকুচিত করে কৃষ্ণ-গহ্বরে পরিণত হয়। তখন তার এই মাধ্যাকর্ষণ যে কাছের সব কিছুকেই গিলে নেয়। শক্তিশালী এরূপ প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে এক একটি (কখনো দুটি) অতিশক্তিশালী কৃষ্ণগহ্বর। একে কেন্দ্র করেই অবিরত ঘুরে চলছে গ্যালাক্সির কোটি কোটি তারারা।

চাঁদ ঘুরে চলছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। পৃথিবী ঘুরে চলেছে সূর্যকে। সূর্যের মত অন্য সব তারারা ঘুরে চলেছে তাদের নিজ নিজ গ্যালাক্সির কেন্দ্রেকে ঘিরে। তাহলে গ্যালাক্সিরাও কি স্থির নেই – অবিরাম চলছে? হ্যাঁ ঠিক তাই। গ্যালাক্সিপুঞ্জরাও ক্রমশ পরস্পরে দূরে সরে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের মহাবিশ্বের কি নির্দিষ্ট কোন আকার নেই? ক্রমশ বেড়েই চলছে? বিজ্ঞানীরা তো তাই বলছেন। মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারমান। কোথায় এই চলার শেষ? কোথা থেকেই বা এর শুরু হয়েছিলো?

শুরুটা কি তাহলে এই ক্রমপ্রসারমান প্রক্রিয়াটির উল্টো/বিপরীত পথে হাঁটলে পাওয়ার যাবে? অর্থাৎ মহাবিশ্বটা আগে ছোট ছিলো তার আগে আরও ছোট ছিলো। এভাবে সময়ের ইতিহাসের সরণী বেয়ে যেতে যেতে একদম শুরুতে কি মহাবিশ্বটা একেবারে ক্ষুদ্র ছিলো? তার সব ভর ও শক্তি একটি বিন্দুতে ঘনীভূত ছিলো? অসীম ঘন আর অসীম ভরের সেই

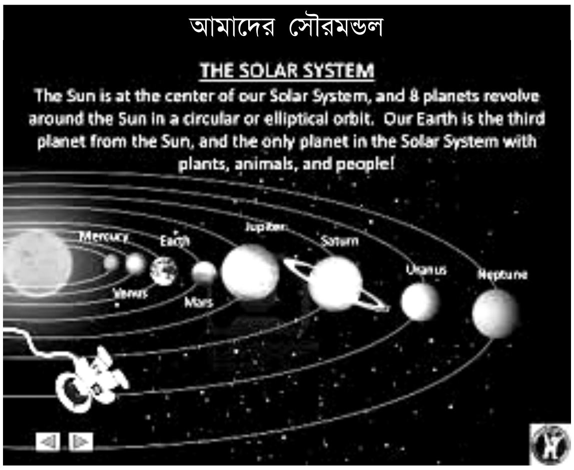

বিন্দুতে (সিঙ্গুলারিটি) বিস্ফোরণে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হল? বিগব্যাং তত্ত্ব তো তাই বলছে।

তবে বিগব্যাং নিয়েও চূড়ান্ত কথা বলার সময় আসেনি। নিত্য নতুন পর্যবেক্ষণে নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। আর এমন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টাই আমাদের পায়ে পায়ে সত্যের আরও কাছাকাছি নিয়ে চলছে।

মহাকাশ নিয়ে নানা প্রশ্ন কবে থেকে যে মানুষের মনে এসেছিলো, সন-তারিখ হিসেব করে হয়ত বলা যাবে না। তবে শত-সহস্র বছর ধরে মানুষ যে কেবল আকাশকে দেখে আসছে – তারাদের দেখে আসছে অজানা নানা প্রশ্ন আর বিস্ময় নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে তা তো নয়। উত্তর খোঁজারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খোঁজার যথাযথ প্রযুক্তি ছিলো না তাদের কাছে। তাই তারা আন্দাজ করত – হয়ত কোন অলৌকিক সত্ত্বা এসব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সেখানে প্রকৃতির নিয়ম থেমে থাকেনি। উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বিশ্বকে জানার চেষ্টাও রেখেছে অব্যাহত।

গ্রিক দার্শনিক আরিস্ততল বলেছিলেন পৃথিবী চ্যাপ্টা থালার মত। পরে তিনি মত পরিবর্তন করে বলেন – পৃথিবী গোলাকার। বিজ্ঞানী ইরাটসথেনিয়াস উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে পৃথিবীর পরিধি বের করলেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অ্যারিস্টকাস বলেছিলেন সৌর কেন্দ্রিক বিশ্বের কথা। অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে। তার প্রায় পাঁচশো বছর পরে টলেমি বললেন উল্টো কথা। পৃথিবী নয়, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। আজ আমরা জানি অ্যারিস্টাকাসই ঠিক বলেছিলেন। যদিও মানুষের ভাগ্য গণনাকারীরা আজও পুরানো মতেই পড়ে রয়েছেন। এরও প্রায় এক হাজার বছর পরে কোপার্নিকাস একটি ধারণা দিলেন। তিনি বললেন পৃথিবী নয়, সূর্যই কয়েছে মাঝখানে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যের চারধারে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। কেপলার অঙ্ক করে দেখলেন – বৃত্তাকার নয়, গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। ইতিমধ্যে দূরবীন আবিষ্কার হল। গ্যালিলিও দূরবীন দিয়ে দেখলেন কেপলারই ঠিক বলেছেন। তিনি আরও দেখলেন উপগ্রহগুলি গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে। বিশ্ব সম্পর্কে এই সত্য কথা বলার জন্য তাকে কি নির্মম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিলো তা আজ কেনা জানে?

যে বছর গ্যালিলিও মারা যান, সে বছরই জন্ম হয় নিউটনের। তিনি বিশ্ববাসীকে শোনালেন – মহাজাগতিক বস্তুগুলি কেমন করে পরিভ্রমণ করে তার নিয়ম। প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করে (মহাকর্ষ)। একথার মধ্যেই মূলতঃ নিহিত আছে পরম স্থিতির অনস্তিত্বের কথা। কেননা, বস্তুগুলির মধ্যে এই আকর্ষণ ক্রিয়া করলে তাদের স্থির থাকা কোন ভাবে সম্ভব নয়। সূর্যের চার পাশে গ্রহগুলির উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ কিংবা পৃথিবীকে চাঁদের প্রদক্ষিণও এই কারণে।

আইনস্টাইনের অপেক্ষবাদ প্রচলিত ধারনায় আরও কঠোর আঘাত হানল, তিনি দেখালেন বস্তুর চূড়ান্ত স্থিতাবস্থা বলে কিছু হয় না; শুধু তাই নয় তিনি বললেন শাশ্বত সময় বলেও কিছু হয় না।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের উপর এর থেকে বড় আঘাত আর কী হতে পারে? কিন্তু আইনস্টাইনকে তার জন্য শাস্তি পেতে হয়নি। ব্রুনোর মত তার জিভ কেটে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়নি। গ্যালিলিওর মতও তাকে ধর্মবাদীদের থেকে নিমর্ম নিপীড়িন সহ্য করতে হয়নি। পরিস্থিতি তো পাল্টেছে। তাই বলে কি সমাজটা বৈজ্ঞতনিক সত্য উদার ভাবে গ্রহণের মুক্তাঙ্গনে পরিণত হয়েছে? সে প্রসঙ্গে না হয় এখন নাইবা গেলাম।

আরিস্ততল ও নিউটন দুজনেই পরম কালে (absolute time) বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কালকে নিশ্চতভাবে মাপা যায় – সে যেই মাপুক না কেন। অর্থাৎ কাল স্থান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্থান নিরপেক্ষ এবং অধিকাংশ লোকই আমরা তাই ভাবি। এভাবনা সাধারণ বুদ্ধিসম্মতও। দৈনন্দিন জীবনে যেসব বস্তুকে আমরা চলতে দেখি এমনকি যে সমস্ত গ্রহ তুলনায় ধীরগামী তাদের ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিজাত ধারণায় কাজ হয়। কিন্তু আলোর দ্রুতি কিংবা তার কাছাকাছি দ্রুতির ক্ষেত্রে গিয়ে গোলমালটা বাধে। যেমন গোলমাল বেধেছিলো আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধকে নিয়ে। বুধের চলন-পথ নিউটনের সূত্র পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব কিন্তু এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিল।

আইনস্টাইন বললেন কাল স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং স্থান নিরপেক্ষও নয়। বরং এদুটির সমন্বয় স্থান কাল সন্ততি (Space-time continuum) গঠিত। অর্থাৎ একটি ঘটনার অবস্থান চারমাত্রিক স্থানে (four dimentional space) করতে হবে। স্থানের জন্য তিনটি স্থানাঙ্ক (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) এবং সময়ের জন্য একটি স্থানাঙ্ক। স্থান-কাল নির্দিষ্ট করতে একই সাথে এই চারটি স্থানাঙ্ককে নিতে হবে। এরই নাম স্থান-কাল (Space - time)।

স্থান-কালের এই চারমাত্রিক গঠনের চিত্র কল্পনা (visual-ize) করতে গেলে আমাদের অতি-মানব হতে হবে। কেননা

আমরা জগৎটাকে ত্রিমাত্রিক দেখতে অভ্যস্থ। আমাদের মস্তিষ্ক সহজেই ত্রিমাত্রিক বস্তুর দৃশ্য / চিত্র কল্পনা করতে পারে। তাহলে উপায়? স্থানিক তিনটি মাত্রাকে একটি অনুভূমিক তলে দুটি মাত্রা হিসেবে চিত্র কল্পনা করা যেতে পারে। আর বাকিটি কালের মাত্রা। এভাবে স্থান-কালের চারমাত্রিক গঠনের ত্রিমাত্রিক চিত্রকল্পনা করা যায়, যেখানে দ্বিমাত্রিক তলটি প্রকৃতপক্ষে চতুর্মাত্রিক স্থানকালের স্থান অংশকে বোঝাবে। সাধারণ অপেক্ষাবাদের মূল বক্তব্য মাধ্যাকর্ষণ হল চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের বক্রতা। বস্তুর ভর স্থানে এই বক্রতা প্রদান করে। যেখানে যত বেশি ভরের তারা বা নক্ষত্র সেখানের স্থান তত বক্র। মাধ্যকর্ষণও তত বেশি। আর নক্ষত্র থেকে দূরে যেখানে মাধ্যাকর্ষণ দুর্বল সেখানে স্থান হল সমতল। যেন রাবারের একটি টানটান সমতল চাদর (স্থান-কালের বুনোট)। তার মাঝে একটি লোহার বল (যেন নক্ষত্র) রাখা হল। তাহলে এই স্থানে টানটান চাদরটি বেঁকে নুইয়ে যাবে। মহাবিশ্বে স্থান কালের বুনোটও এরকম। তাই ভারী নক্ষত্রের কাছে আলো বেঁকে যায়। কৃষ্ণগহবরের স্থান-কালের বুনোট এতই কুঞ্চিত (অসীম বক্রতা) তার গ্রাসে একবার আলো প্রবেশ করলে আর ফিরে আসতে পারে না।

আর কাল? স্থান-কালের বক্রতা যত বেশি হয় কালও তত ধীরে চলে। আর তাই আপনি যদি কৃষ্ণ গহবরের দিকে যাত্রা করেন স্থান-কালের বক্রতা বাড়ার সাথে সাথে আপনার সময়ও ক্রমশঃ ধীরে চলবে। অবশেষে কৃষ্ণগহবরে পৌঁছে (ইভেন্ট হরাইজন) গেলে সময়ের চলা থেমে যাবে। আপনি কিন্তু তা বুঝতে পারবেন না। কারণ, আপনার হৃদস্পন্দন, বিপাকক্রিয়া, এমনকি মস্তিষ্কের ভিতর চিন্তাভাবনার পদ্ধতিও ধীরে চলবে। কিন্তু আপনি যদি সমতল স্থান-কাল অঞ্চলে (যেখানে থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন) থাকা আপনার বন্ধুর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারেন, তাহলে আপনার হাতঘড়ির স্বাভাবিকের থেকে ক্রমশ ধীরে চলার ছন্দ বুঝতে পারবেন।

আইনস্টাইনের আপক্ষিকতা তত্ত্ব শাশ্বত সময় নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করল। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বকেও কাঠগড়ায় দাড় করাল। কেউ কেউ বললেন – সংশোধিত মহাকর্ষ তত্ত্বের নাম সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। এই সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সমীকরণগুলিকে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বর গবেষণায় কাজে লাগালেন রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার আলেকজান্দ্রোভিচ ফ্রিডম্যান। দেখা গেল সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সমর্থনে যুক্তি। তার মৃত্যুর পর বেলিজিয়ামের পাদ্রি ও পদার্থবিদ জর্জেস লেনেত্র ফ্রিডম্যানের মহাবিশ্ব মডেল নিয়ে আবার কাজ শুরু করেন। ১৯৩১ সালে তিনি প্রকাশ করলেন বিগব্যাং মডেল।

আজ নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল বিগব্যাং-এর সমর্থনে নানা তথ্য হাজির করছে। ১৯২৯ সালেই বিজ্ঞানী হাবল (Hubble) আবিষ্কার করেছিলেন গ্যালাক্সিপুঞ্জ পরস্পরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি ডপলারের তত্ত্ব কাজে লাগিয়েছিলেন। আবিষ্কার হয়েছে মহাজগতিক বিকিরণ (Cosmic Microwave Background Radiation - CMBR)। এর বর্ণালী (তীব্রতা বনাম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লেখচিত্র) 2.725^0k উষ্ণতায় প্লাংকের কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের বর্ণালীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যা বিগ ব্যাং তত্ত্বকেই সমর্থন করে। ১৯৯০ সালে তো নাসা'র পাঠানো COBE (Cosmic Background Explorer) মহাকাশযানটি মহাকাশ বিকিরণ তাপমাত্রার পরিমাণ 2.725^0k বের করেছিল – যা CMBR কর্তৃক নির্ণেয় তাপমাত্রার সাথে একেবারে মিলে যাচ্ছে।

জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব প্রসারণের হার মেপেছেন। গড় ঘনত্ব বের করেছেন। তা থেকে অঙ্ক কষে এখন বলা যায় বিগব্যাং বিস্ফোরণ হয়েছিলো মোটামুটি ১৩,৭০০ ($\pm$ ১%) কোটি বছর আগে। তখন থেকে মহাবিশ্বের পথ চলা শুরু হয়েছিলো। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বয়স ১৩ হাজার ৭০০ কোটি বছর।

কিন্তু এটা একেবারে নির্ভুল বলা চলে না। কেননা পৃথিবীর গড় ঘনত্ব পরিমাপে জটিলতা আছে। আর মহাবিশ্বের প্রসারণের হারও সর্বদা একই রকম নয়। তবে দিন যত এগোচ্ছে, নতুন নতুন তথ্য হাতে আসছে; আর গণনার নির্ভুলতাও তত বাড়ছে।

বিজ্ঞনীরা তাই চূড়ান্ত কথা বলছেন না। তবে এখন পর্যন্ত বলতে পারেন – বিগব্যাং হল মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সীমা। তবে ঐ যে বললাম – দিন যত এগোচ্ছে ... নিত্য নতুন পর্যবেক্ষন আমাদের তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে। অজানা রহস্যের এক একটি বন্ধ দুয়ার আমাদের সামনে খুলে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে জানান দিচ্ছে – মহাবিশ্ব সৃষ্টির সত্যিকারের গল্পটা, বিশ্বসৃষ্টি নিয়ে যে সব ধর্মীয় আকাশকুসুম গল্প এবং লোককথা আছে, তার চেয়ে তা অনেক অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আপনি কি এখনো অলৌকিক কল্পনার রুদ্ধদ্বারে নিজেকে বন্ধ করে রাখবেন, না সত্যের মুখোমুখি হবেন? আপনি কি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়াটাকে ভাল মনে করবেন, না উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মহাবিশ্বকে জানার-বোঝার চেষ্টাকে স্বাগত জানাবেন; মহাকাশের সত্যিকারের পরিচয় খুঁজবেন? সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকেই।■

মহাকাশে কৃষ্ণগহ্বর

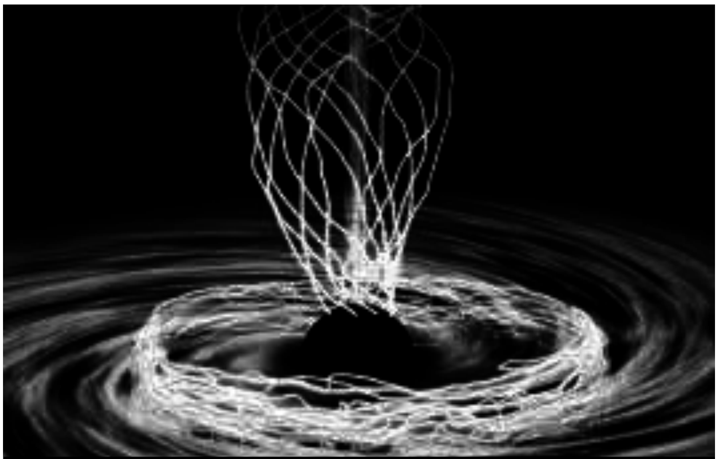

কৃষ্ণগহ্বর ও তার কেশ

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য জানতে বিজ্ঞানীদের উৎসাহের অন্ত নেই। অনুসন্ধিৎসু সকল মানুষও তাকিয়ে থাকে বিজ্ঞানীদের দিকে কবে এই অজানা হেঁয়ালির উত্তর মিলবে। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের ভর আর তার প্রসারণের হার থেকে হিসেব করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মহাবিশ্বের ৯০ শতাংশ ভর ঘাটতির হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল সেই ভর? সেই ভরের হিসেব করতে গিয়েই 'কৃষ্ণ গহ্বর' বা ব্ল্যাক হোল-এর ধারনা প্রবল হয়। লুকনো এই ভরের হিসেব কি কৃষ্ণ-গহ্বর দিতে পারে? বা কৃষ্ণগহ্বর কি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্যতথ্য সংরক্ষণ করে রেখেছে?

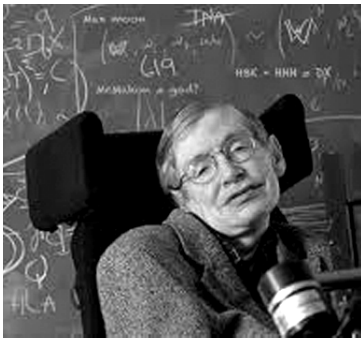

সম্প্রতি স্টিফেন হকিং এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে এমনই এক নতুন কথা শোনালেন – কৃষ্ণগহ্বরের মাথায় নাকি চুল বা কেশ আছে। এই বৈদ্যুতিক কেশ শূন্য শক্তির কণা – কোমল ফোটন ও গ্রাভিট্রন দিয়ে তৈরি। আর এই কেশগুলিই জমিয়ে রাখছে কৃষ্ণগহ্বর যে রাশি রাশি বস্তু তথা তথ্য গিলে নিচ্ছে তার অন্তত কিছুটা।

হ্যাঁ, কৃষ্ণগহ্বর রাশি রাশি বস্তু গিলে নিচ্ছে। আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদ অনুসারে – **কৃষ্ণগহ্বর অসীম ঘনত্বের এক মহাজাগতিক বস্তু যা স্থান-কালকে এমনভাবে কুঞ্চিত করে যে আলোকরশ্মিও তার থাবা থেকে মুক্তি পায় না।** পাবে কি করে? কৃষ্ণগহ্বরে কোন বস্তুর মুক্তি বেগের মান আলোর বেগের থেকেও বেশি। যেহেতু আলোর বেগের থেকে বেশি বেগ অর্জন করা কোনো বস্তুর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তার মুক্তির সম্ভাবনাও আর থাকে না।

মহাকাশে এরূপ ঘাপটি মেরে থাকা অদৃশ্য গহ্বরগুলিকে কৃষ্ণ গহ্বর ছাড়া আর কিইবা বলা চলে। অসীম বক্রতা মহাবিশ্বের স্থান-কালের বুনোটকে এমনভাবে বাঁকিয়ে দিয়েছে যে, তা যেন মহাবিশ্বের স্থান-কালের চাদরে একটি ফুটোর আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই এটি গহ্বর।

বিজ্ঞানীদের ধারণা এরূপ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হয়েছিলো "বিগ ব্যাং"-এর কেবল পরেই। নাসা'র তথ্য অনুযায়ী এদের আকার এক একটি প্রোটনের থেকেও ক্ষুদ্র আর ভর পর্বতের থেকেও বেশি। অন্য এক ধরনের কৃষ্ণগহ্বর হল অতিভর কৃষ্ণগহ্বর (সুপারমেসিভ ব্ল্যাক হোল) এদের ভর অত্যন্ত বেশি। আর এরূপ এক একটি (বা দুটি) কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে।

কি করে সৃষ্টি হয় এই কৃষ্ণগহ্বর? নক্ষত্রের বা তারাদের জন্ম মৃত্যুর কথা আমরা শুনেছি। তারার মৃত্যু থেকেই কৃষ্ণগহ্বরের জন্ম হয়। তবে সব তারার মৃত্যু হলেই কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয় না। বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর হিসেব করে দেখিয়েছিলেন শীতল তারার ভর সূর্যের ভরের প্রায় দেড় গুণের চাইতে বেশি হলে সে নিজের মহাকর্ষ (মাধ্যাকর্ষণ) থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। ভরের এই সীমাকে চন্দ্রশেখর সীমা (চন্দ্রশেখর লিমিট) বলে।

জীবনকালে তারাদের প্রতি মুহূর্তে তীব্র টানা পোড়েনের ভিতর

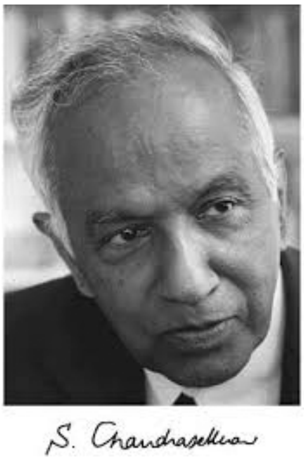

দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কেমন সেটা? তারার অভ্যন্তরে সর্বদা নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটে চলছে। হাইড্রোজেন পুড়ে তৈরী হচ্ছে হিলিয়াম (ফিউশন পদ্ধতি) আর তাতে উৎপন্ন শক্তির বিকিরণে বাইরের দিকে একটি বল ক্রিয়া করছে। তারাটির কেন্দ্রমুখী মাধ্যাকর্ষণ আর এই কেন্দ্র বিমুখী বাহিরি বলের মধ্যে যতক্ষণ বোঝাপড়া থাকছে ততক্ষণ তারাটি বেঁচে থাকে। কিন্তু এক সময় নিউক্লিয় বিক্রিয়ার জ্বালানী (হাইড্রোজেন) কমে এলে বিকিরণ কমতে থাকে। বাহিরি বলও কমতে থাকে। তুলনায় মাধ্যাকর্ষ টান বেড়ে যায়। আর তারাটি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে।

যেসব তারা খুব বড় নয়, ভর যদি চন্দ্রশেখর সীমার থেকে কম তারা কিন্তু একটা পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে আর সংকুচিত হয় না। কারণ এই অবস্থায় পরমাণুগুলি এতই ঠাসাঠাসি করে থাকে যে ইলেকট্রনগুলি পর্যন্ত পরমাণু কেন্দ্রকের স্থির বৈদ্যুতিক বলের প্রভাব কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এবং ইলেকট্রনের ঘনত্ব খুব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ইলেকট্রনগুলি এক প্রবল শক্তিশালী বিরুদ্ধ বলের সৃষ্টি করে, যে বল মুমূর্ষু তারাটির আরও সংকোচন হওয়ার প্রবণতাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ইলেকট্রনগুলি এতই ঘনসন্নিবিশিষ্ট হয় যে তারাটির আর অতি সামান্য সংকোচন হলেই দুটি ইলেকট্রনকে একই অবস্থাতে চলে আসতে বাধ্য করা হয়। পদার্থবিদ্যার ভাষায় – যেন দুই বা তার বেশি সংখ্যক ইলেকট্রনকে একই 'কণাবাদী যান্ত্রিক অবস্থায়' (কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল স্টেট) নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। যেটা প্রকৃতির নিয়ম অর্থাৎ পাউলির 'অপবর্জন নীতি' (এক্সক্লুসন প্রিনসিপাল ঃ অনিশ্চয়তার নীতি দ্বারা নির্ধারিত সীমার ভিতরে দুটি সমরূপ চক্রন $\frac{1}{2}$ $\left(spin\frac{1}{2}\right)$ কণিকার দুটিরই একই অবস্থান এবং একই গতিবেগ থাকতে পারে না।) অনুসারে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই তারাটি আর সংকুচিত হতে পারে না। নিউক্লিয় বিক্রিয়া না থাকায় অবশেষে নক্ষত্রটি ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে মহাশান্তিতে মৃত্যুবরণ করে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'হায়াইট ডুয়ার্ফ' বা শ্বেত বামন তারা। আমাদের সূর্যের অন্তিম পরিণতিও তাই। তবে বিচলিত হবেন না। এই ঘটনা দেখতে আপনাকে আরও পাঁচশ কোটি বছর বেঁচে থাকতে হবে।

তারার আর একটি অন্তিম দশা – নিউট্রন তারকা। যাদের ভর সূর্যের ভরের এক বা দুই গুণের ভিতরে কিন্তু আকার শ্বেত বামনের থেকেও ছোট – এই তারকাগুলিকেও রক্ষা করে অপবর্জন তত্ত্ব ভিত্তিক বিকর্ষণ (Exclusion Principal repulsion)। কিন্তু এই বিকর্ষণ ইলেকট্রনের নয়। নিউট্রন ও প্রোটনের।

আর বিশাল ভরের তারার ক্ষেত্রে তীব্র মাধ্যাকর্ষ টানে তারাটি যখন সংকুচিত হতে থাকে, তার চারদিকের বস্তুরাশিকে প্রবল বেগে ঝেড়ে ফেলতে থাকে – যাকে বলে সুপারনোভা বিস্ফোরণ। তারপর যে অবস্থায় তারাটি পরে থাকে, তখন যদি ভর চন্দ্রশেখর সীমার থেকে বেশি থাকে, তাহলে তারাটি সংকুচিত হতে হতে একসময় একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। যাকে গণিতের ভাষায় বলছে সিঙ্গুলারিটি বা অনন্যতা। অনন্যতায় এসে ঘনত্ব অসীম হয়ে যায়। মাধ্যাকর্ষণের মানও অসীম হয়। মুক্তি বেগের মান দাঁড়ায় আলোর গতিবেগের বেশি। **তারার এই দশাই হল ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর। কৃষ্ণগহ্বরের যে দূরত্বে থাকলে একটি বস্তুর মুক্তি বেগ আলোর গতিবেগের সমান হবে, বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন 'ইভেন্ট হরাইজন' বা 'ঘটনা দিগন্ত'।** তাই 'ঘটনা দিগন্ত' ছাড়িয়ে যে কৃষ্ণগহ্বরের আরও কাছে যাবে, সে কখনো ফিরে আসতে পারবে না।

কিন্তু ভরহীন আলো কেন কৃষ্ণগহ্বরের খপ্পর থেকে রেহাই পায় না? এ ব্যাখ্যা কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব থেকে পাওয়া যাবে না। নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে – যার ভর নেই তার মহাকর্ষ থাকল কি থাকল না, অর্থাৎ বলতে হয় আলোর কিছু যায় আসে না। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন ভিন্ন কথা। ভর নয়, বক্র স্থান-কাল (curved space time) থেকে মহাকর্ষের জন্ম। বস্তুর ভর ও ব্যাসার্ধ স্থান কালকে বক্রতা দান করে। মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে সেগুলি স্থান-কালকে প্রভাবিত করে এবং স্থান কাল নিজেরাও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই আলো যদি শক্তিশালী মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যায় স্থান-কাল বক্রতার জন্যই সে বেঁকে যাবে। স্থান-কালের চতুর্মাত্রিক গঠনে আলোর ক্ষেত্রে এটাই সরল পথ। যা ত্রিমাত্রিক বিশ্ব-দর্শনে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ত্রিমাত্রিক স্থানে আমাদের মনে হয় আলো বেঁকে যাচ্ছে।

আলো বেঁকে যাওয়ার ঘটনা প্রথম প্রমাণিত হয় **১৯১৯** সালে। জ্যোতির্বিদ স্যার আর্থার এডিংটন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় দেখালেন আলো যত সূর্যের কাছাকাছি যাচ্ছে, তত বেঁকে যাচ্ছে। আইনস্টাইনের ব্যাপক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (General Theory of Relativity) ভবিষ্যৎবাণী প্রমাণিত হল। আর

কৃষ্ণগহ্বরের তীব্র আকর্ষণে তারাদের বিভিন্ন পরিবর্তনের পর্যায়

কৃষ্ণগহ্বরে স্থান-কালের অসীম বক্রতায় আলো আটকে পড়ে।

কৃষ্ণগহ্বরে যদি আলো আটকে পড়ে অর্থাৎ ফিরে আসতে না পারে, তাহলে কৃষ্ণগহ্বরকে দেখতে কেমন লাগবে? কোন বস্তুকে আমরা দেখি যখন ঐ বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। ফলে কৃষ্ণগহ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। তাহলে তার অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব?

সরাসরি দেখতে না পেলেও পরোক্ষভাবে কিন্তু আমরা তা পারি। তারাদের উপর কৃষ্ণগহ্বরের প্রভাব এবং সংলগ্ন ধুলিকণা, গ্যাসের উপর তার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। এবং বিজ্ঞানীরা তাই করেন।

ব্ল্যাক হোল (ঘটনা দিগন্তের) নিকট ঠিকরে বেরিয়ে আসা এক্সরে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা তাপমাত্রা ও কৌণিক গতিবেগ মাপতে পারেন, এমনকি ভরও। তারপর নিঃসন্দেহে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বের কথা বলতে পারেন। ইতিমধ্যে এভাবে অনেক কৃষ্ণগহ্বর আবিষ্কার হয়েছে। আমাদেরই গ্যালাক্সিতে যে খুব ভারী কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পাওয়া গেছে তার ভর সূর্যের ভরের দুকোটি গুণ।

দু'হাজার আলোকবর্ষ দূরে (যে দূরত্ব থেকে আলো আসতে দু'হাজার বছর সময় লাগে) রয়েছে সিগনাস X-1।

একে আবর্তন করে চলছে অন্য একটি তারা। তারাটি থেকে গ্যাস ধুলিকনা মহাকর্ষের টানে তীরবেগে ছিটকে যাচ্ছে সিগনাসের গর্ভের দিকে। সিগনাসের চারপাশে 'ঘটনা দিগন্ত'

ঘটনা দিগন্ত

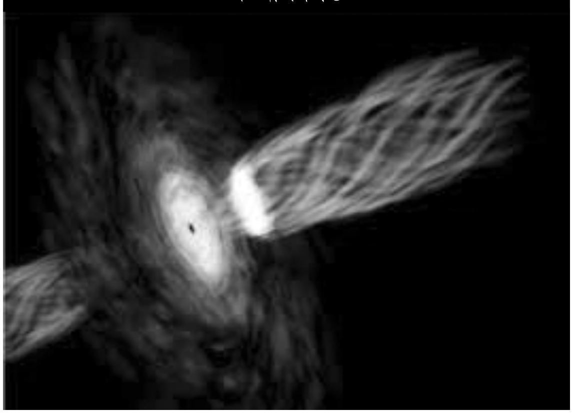

ঘিরে অনবরত ঘুরছে। এতে গ্যাস ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে, ঘর্ষণবল বাড়তে থাকে, গ্যাসীয় অনুগুলির ও ধুলিকণাগুলির গতিশক্তিও অসম্ভব বেড়ে যায়। ঘটনা দিগন্তের চারপাশে এই যে গ্যাস আর ধুলিকণা ঘুরপাক খায় – বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'অ্যাক্রেশন ডিস্ক'। অ্যাক্রেশন ডিস্কে এই অস্থির অবস্থা থেকেই জন্ম নেয় এক্স-রে, যা ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসে; আর বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দেয়।

তাহলে কৃষ্ণগহ্বরকে কি সত্যিই কালো বলা চলে? একসময় কৃষ্ণগহ্বর বিকিরণের (ব্ল্যাকহোল রেডিয়েশন) কথা বিজ্ঞানীরা না মানলেও আজ তা প্রমাণিত (হকিং রেডিয়েশন)। স্টিফেন হকিং-এর একসময় অভিমত ছিল – যদি কোনও কণামাত্রও কৃষ্ণগহ্বরের গর্ভে ঢুকে যায় তবে তার সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের এক সফল স্তম্ভ – কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলছে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা – অতীতে যে তথ্যের অস্তিত্ব ছিলো, তত্ত্ব অন্তত একথা বলে – তাদের পুনরুদ্ধার সম্ভব (Information that existed in the past should be theoretically recoverable.)। হকিং সরে এসেছেন নিজের অভিমত থেকে। পুনর্গণনা করে দেখেছেন – তথ্য সত্যিই লিক্ করে বেরোতে পারে কৃষ্ণগহ্বর থেকে। কিন্তু কিভাবে?

এই নিয়েই সম্প্রতি স্টিফেন হকিং এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কৃষ্ণগহ্বর-কেশের (black hole heir) কথা বলেছেন; যা কিনা মহাবিশ্ব থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া অনেক তথ্য সংরক্ষণ করে রাখছে। বিজ্ঞানীরা যদি তার নাগাল পান, তাহলে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণও হয়ত তাদের হাতে এসে যেতে পারে। আর তা নিঃসন্দেহে সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে। আমরা সবাই সেই দিকেই তাকিয়ে আছি! ■

বিশেষ নিবন্ধ ঃ

প্যারিস-জলবায়ু সম্মেলন কোন উদ্দেশ্যে ?

বিশ্বের ১৪৭টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতে ২০১৫-এর ৩০শে নভেম্বর প্যারিসে, রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে, “জলবায়ু পরিবর্তন” বিষয়ক সম্মেলন শুরু হয়, চলে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সম্মেলনের বীজ রোপন হয়েছিল ১৯৭২ সালে স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের, ‘মানব পরিবেশ’ বিষয়ে প্রথম অধিবেশনে – যেখানে সিদ্ধান্ত হয় প্রতি বছর ৫ই জুনকে, “বিশ্ব পরিবেশ দিবস” রূপে পালন করা হবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের মাধ্যমে বিশ্বের সাধারণ মানুষকে, পরিবেশ স্থিতিশীল রাখার বিষয়ে সচেতন করার (অর্থাৎ এঁদের মতে পরিবেশ তথা জলবায়ু অপরিবর্তনশীল!) পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৮৫ সালে অস্ট্রিয়াতে, “কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিন-হাউস গ্যাসের প্রভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ও সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন” শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের পরে, পরিবেশবাদের নামে বিশ্বের পুঁজিপতিশ্রেণীর এক চক্র “সবুজ সাম্রাজ্যবাদী”বলা তাদের দ্বারা, “মনুষ্য কর্তৃক বিশ্ব উষ্ণায়ণ”-এর তত্ত্ব সাধারণের সামনে হাজির করা হয়। বিশ্বব্যাপী বিক্ষিপ্তভাবে আঞ্চলিক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে ওঠে পরিবেশবাদী আন্দোলন। এই “সবুজ সাম্রাজ্যবাদী”দের চাপে, পরিবেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং রাষ্ট্রের আইনের তা স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলস্বরূপ ১৯৮৮তে রাষ্ট্র সংঘ দ্বারা একটি বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) গঠিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিতে, রাষ্ট্র সংঘের দ্বিতীয় পরিবেশ সম্মেলনে, [বসুন্ধরা সম্মেলন (আর্থ সামিট) UNFCC [ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ] চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদিও উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতবিরোধ থাকায় এতে কোন বাধ্যতামূলক আইন রাখা হয়নি। রাষ্ট্র সংঘ সদস্য রাষ্ট্রের সরকারগুলিকে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির বিষয়ে এমনভাবে পুনর্বিবেচনা করতে বলে যাতে পুনর্নবীকরণ যোগ্য নয় এমন শক্তির উৎসগুলির ব্যবহার হ্রাস করা যায়। এই চুক্তিতে বলা হয় উন্নত রাষ্ট্রগুলি তাদের গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালে যতটা হতো সেই মাত্রায় নামিয়ে আনার চেষ্ট করবে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির কোন দায়িত্ব থাকবে না। ১৯৯৪ সালে ৫০টি দেশ এই চুক্তিতে সম্মতি দেয়। ফলে রাষ্টসংঘের নিয়মানুযায়ী চুক্তিটি কার্যকর হয়। ঠিক হয় স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি প্রতিবছর একবার করে মিলিত হবে একটি সম্মেলনে, যার নাম দেওয়া হয় সি.ও.পি. বা কপ (কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিজ)। ১৯৯৫ সালে বার্লিনে, “কপ”এর প্রথম অধিবেশন হয়। এই কপ-এরই ২১তম সম্মেলন গত ডিসেম্বরে প্যারিসে সম্পন্ন হয়।

সারণী ১

বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত সম্মেলন

বসুন্ধরা সম্মেলন	রিও দ্য জেনেইরো, ব্রাজিল, ১৯৯২
সদস্য সম্মেলন	
১	বার্লিন, জার্মানি, ১৯৯৫
২	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড, ১৯৯৬
৩	কিয়োটো, জাপান, ১৯৯৭
৪	বুয়েনস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা, ১৯৯৮
৫	বন, জার্মানি, ১৯৯৯
৬	দ্য হেগ, নেদারল্যান্ড, ২০০০
৬	বন, জার্মানি, ২০০১
৭	মারাকেশ, মরক্কো, ২০০১
৮	নিউ দিল্লি, ভারত, ২০০২
৯	মিলান, ইতালি, ২০০৩
১০	বুয়েনস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা, ২০০৪
১১	মন্ট্রিল, কানাডা, ২০০৫
১২	নাইরোবি, কেনিয়া, ২০০৬
১৩	বালি, ইন্দোনেশিয়া, ২০০৭
১৪	পোৎসনান, পোল্যান্ড, ২০০৮
১৫	কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক, ২০০৯
১৬	কানকুন, মেক্সিকো, ২০১০
১৭	ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০১১
১৮	দোহা, কাতার, ২০১২
১৯	ওয়ারশ, পোল্যান্ড, ২০১৩
২০	লিমা, পেরু, ২০১৪
২১	প্যারিস, ফ্রান্স, ২০১৫

আইপিসিসি'র বিজ্ঞানীরা তাদের সার্টিফিকেটকে কাজে লাগিয়ে, অবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে প্রচার শুরু করে। সমাজে শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বড় অংশ, বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে, আইপিসিসি'র বক্তব্য দ্বারা আবেশিত হয়ে – তারই প্রচারক বনে যায়। সরকারী, বেসরকারী, অসরকারী – সর্বস্তরের প্রচার মাধ্যম থেকেই আইপিসিসি'র বক্তব্যকে প্রচার করা হয়। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায়, নিম্নশ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত, "পরিবেশ বিদ্যায়" আইপিসিসি'র বক্তব্যকেই শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির করা হয়েছে। আইপিসিসি'র অবৈজ্ঞানিক বক্তব্যের বিরোধী – বিজ্ঞানীদের বক্তব্য তেমনভাবে প্রচার না পেলেও তা নিয়মিত জারি ছিল। পরিবেশ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক নিয়মকে আইপিসিসি'র পক্ষ থেকে আড়াল করতে, বিশ্ব-উষ্ণায়ণের জন্য মানব সভ্যতায় ফসিল ফুয়েলের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে। আইপিসিসি'র বক্তব্যের বিরোধী বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিষ্কার জানানো হয়, "বিশ্ব উষ্ণায়ণ" একটি প্রাকৃতিক ঘটনা – যার মহাজাগতিক কারণ, মিলানকোভিচ চক্র'র ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবের জন্য প্রধানভাবে দায়ী জলীয় বাষ্প যা প্রাকৃতিক। জল চক্রের একটা পর্যায় প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়। কার্বন-চক্রের সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়ণের কোনো সম্পর্ক নেই – কেননা সমুদ্র অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে নেয়। এছাড়া কার্বন ডাই অক্সাইডের হ্রাস বৃদ্ধির উপর পরিবেশের তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না, বরঞ্চ পরিবেশের তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এরপর আইপিসিসি'র পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়, মনুষ্যজনিত কারণে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসই বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পজিটিভ ফিডব্যাকের জন্য দায়ী। সাম্প্রতিককালে পেটোয়া বিজ্ঞানীদের দিয়ে কোন গবেষণালব্ধ তথ্য ছাড়াই তারা একথাও প্রচার করছে যে সমুদ্রের জল নাকি নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইডকে দ্রবীভূত করতে পারছে না।

কার্বন বাজেট ঃ আইপিসিসি'র প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে, এক নম্বর কর্মী গোষ্ঠীর রিপোর্টে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে বিশ্বজনীন 'কার্বন বাজেট'-এর কথা। এই কার্বন বাজেট নির্ধারণ করার জন্য যে ধারণার ব্যাখ্যা করা হয়েছে – তা হলো, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে, বিশ্বের তাপমাত্রা মোটামুটি ভাবে ঐ সময়কালে নির্গত গ্রিন-হাউস গ্যাসের সমানুপাতিক হারে বাড়ে। তাই সরাসরি কার্বন নির্গমনের মোট পরিমাণ এখানে প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে কতটা কার্বন নির্গমন অনুমোদন করা হবে, তা নির্ধারণের সহজ, চটজলদি পদ্ধতিই হলো কার্বন বাজেট। এই কার্বন বাজেট নির্ধারণ করতে ১৮৫০ সালকে অথবা ১৮৭০ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসাবে মাথাপিছু নির্গমন অনুমোদিত হয়। ততটাই নির্গমন অনুমোদন করা হবে যাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২° সেন্টিগ্রেডের বেশি না বাড়ে। ২০০৯ সালে কোপেন হেগেন সম্মেলন ও তার পরের বছর কানকুন সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির সহমতের ভিত্তিতে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ধরে রাখতে কার্বন বাজেট নির্ধারণ হয় ৯৯২-১২১২ গিগাটনের – যা হলো ২১০০ সাল পর্যন্ত গোটা বিশ্বে নির্গমনের মোট পরিমাণ। হিসাব অনুযায়ী ৪৪৫-৫৮৫ গিগাটন নির্গমন ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। ১৮৭০ সাল থেকে ২১০০ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু ভাগ অনুযায়ী প্রথম সারির প্রতিটি দেশের জন্য 'কার্বন বাজেট অধিকার' হলো ২১০ গিগাটন। কিন্তু বাস্তবে ২০১২ সালের মধ্যেই উক্ত দেশগুলি ৩৮০ গিগাটন কার্বন নির্গমন করে ফেলেছে। অর্থাৎ উন্নত দেশগুলি ইতিমধ্যে কার্বন বাজেটে তাদের ভাগ শেষ করে বসে আছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল শিল্প ক্ষেত্রে শক্তির উৎস স্বরূপ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের জন্য। শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের ইতিহাসে এবং বর্তমানেও শক্তির উৎস স্বরূপ জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্পের সন্ধান মেলে নি। এই কারণেই "জলবায়ু পরিবর্তন" সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে ইউরোপ, আমেরিকার মত উন্নত দেশগুলি কার্বন নির্গমন হ্রাস করার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা লাগু করতে দেয় নি এবং কার্বন নির্গমণ হ্রাস করার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেনি। আইনি বাধ্যবাধকতা ছাড়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়বদ্ধতা থাকে না। শিল্পনির্ভর অন্য ক্ষেত্রে পুননবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন বাজেট কোন দেশ বা দেশগোষ্ঠী একবার ব্যবহার করে ফেললে, অন্যদের ভাগে ভাগ বসাবে। তাই যে সকল দেশ এখনও কার্বন বাজেট নিয়ে দীর্ঘকালীন লক্ষ্য ঘোষণা করেনি, ভবিষ্যতে কার্বন বাজেটের ভাগ পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হবে। যেমন বিশ্বজনীন কার্বন বাজেটে ১৮৭০ সাল থেকে ২১০০ সাল পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ন্যায্য ভাগ হওয়া উচিত ১৮২-১৮৬ গিগাটন। কিন্তু বাস্তবে ভারত পেতে চলেছে ৮৩-১০৯ গিগাটন। এই কার্বন বাজেট'ই কার্বন বাণিজ্যের ক্ষেত্র রচনা করে।

কার্বন বাণিজ্য

কিয়োটো চুক্তিতে উন্নত দেশগুলিকে, বাতাসে অধিক পরিমাণ কার্বন নির্গমনের জন্য প্রধানভাবে দায়ী করা হয় এবং কোন দেশকে কি মাত্রায় কার্বন নির্গমন কমাতে হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। কিয়োটো প্রোটোকলের ১২ নং ধারায় কার্বন নির্গমন হ্রাসের পন্থা স্বরূপ কার্বন-বাণিজ্যের বিষয়টি উঠে আসে। একে দূষণমুক্ত উন্নয়ন ব্যবস্থা [Clean Development Mechanism - CDM] বলা হয়। ২০০৩-২০১৪ সময়কালে মোট ৭৫৮৯টি সিডিএম প্রকল্পের মধ্যে ১৫৪১টি ছিল ভারত থেকে যা বিশ্বে দ্বিতীয়। মোট ১৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ভারতীয় প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায় মোট ৩২২৭টি প্রকল্পের মধ্যে ভারতীয় প্রকল্প মাত্র ৩০৭টি। বিশ্ব ব্যাঙ্ক কার্বন বাণিজ্যের প্রধান অংশীদার। কার্বন বাণিজ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের নিজস্ব ফিনান্স ফান্ড ২০০৪-এর ৪১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৯১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

কার্বন বাণিজ্য দুভাবে করা যেতে পারে। প্রথমত পরিশিষ্ট-১ তালিকাভুক্ত দেশ (উন্নত দেশ) তার কোটা অপেক্ষা নিঃসরণ বাড়িয়ে কিছু কার্বন অধিকার রোজগার করতে পারে এবং সেই অর্জিত কার্বন অধিকার, ঘাটতি আছে যে দেশের তার কাছে বিক্রি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, নিজের দেশের নিঃসরণ যে কমাতে পারল না সে দ্বিতীয় কোন দেশে কার্বন সাশ্রয়কারী কোন প্রকল্পে লগ্নি করে সে দেশের নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রোটোকলে সম্মতি না দিলেও, আঞ্চলিকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কার্বন বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং কার্বন বাণিজ্য প্রকৃতপক্ষে কোন দেশে কার্বন নির্গমন বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস করার পরিবর্তে একটি বাজারী পদ্ধতি চালু করা – যা টাকার বিনিময়ে কার্বন নির্গমন বিষয়টি শিল্পপতি তথা পুঁজিপতির প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের উপর দাঁড় করায়।

প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন

প্যারিসে 'জলবায়ু সম্মেলন' সূচনার দিনে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, আমেরিকার নিউইয়র্ক, ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলি বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বেঁধে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয় এবং মিটিং মিছিল করে। শেষ পর্যন্ত, প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে ১৯৬টি দেশ যে চুক্তিতে সায় দিয়েছে, যা ২০১৬ সালের ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত হবে, তার বিষয়গুলি হলো –

১) শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ২১ শতক সময়কাল পর্যন্ত ২° সেলসিয়াসের অনেকটা নিচে ১.৫° সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার চেষ্টা চালান হবে।

২) বিভিন্ন দেশগুলি কার্বন নির্গমন কমানোর যে টার্গেট ঘোষণা করেছে – তা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর 'রিভিউ' করা হবে।

৩) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে, ফলাফল কতদূর খারাপ হতে পারে সে বিষয়ে সবিস্তারে আইপিসিসি'কে ২০১৮ সালে বিশেষ রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

৪) গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে, কয়লার মতন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত হ্রাস করতে হবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর উন্নত দেশগুলি, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য করবে। সৌর শক্তি, বায়ুশক্তির মত পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন বাড়ানোর পেছনেই এই অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৫) এই শতকের মধ্যেই গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন ও শোষণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে – যাতে মনুষ্যজনিত কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন না ঘটে।

প্যারিস সম্মেলন প্রসঙ্গে শিল্পপতি ও রাষ্ট্রনায়কদের ভূমিকা ও মন্তব্য

পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদন প্রযুক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে, প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে, "ব্রেকথ্রু এনার্জি কোয়ালিশন" নামক মহাজোটে সহস্রাধিক কোটি মার্কিন ডলার বিনিযোগের শপথ নেয় বিশ্বের ২৮ জন ধনীতম শিল্পপতি। এরা হলে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, ফেসবুক কর্ণধার মার্ক জুকারবার্গ, আলিবাবার চেয়ারম্যান জ্যাকমা, অ্যামাজনের সিইও জেক বেহেস, টাটা সন্সসের প্রাক্তন কর্ণধার রতন টাটা, রিলায়েন্সের চেয়ারম্যান মুকেশ অম্বানি, আফ্রিকার রেনবো মিনারেলসের কর্ণধার প্যাট্রিস মতসেপে, প্রমুখ। আমেরিকা, ফ্রান্স, ভারত সহ মোট ১৭টি দেশ পরিচ্ছন্ন শক্তি নিয়ে গবেষণা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করার শপথ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের নাম মিশন

"ইনভেন্টিভ ইনিশিয়েটিভ"।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, প্যারিস চুক্তিতে আসলে জলবায়ুর প্রতি সুবিচার হয়েছে। এতে কারো হার বা কারো জিত নয় – বরঞ্চ সবুজ পৃথিবীর জন্য সবাই একসাথে লড়ছে। চীনের সরকারি সংবাদ সংস্থা সিনহুয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি – যা জলবায়ু পরিবর্তনে লাগাম টানতে চেয়েছে, যা মানবতার জন্য একটি টেকসই উন্নয়নের সুরক্ষায় সাধারণ লক্ষ্যের একটি মাইল-ফলক হয়ে থাকবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামা বলেছেন, "দিস ইজ হিউজ"। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, "এই চুক্তি ঐতিহাসিক"। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বরাক ওবামার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা ব্রায়ান ডিজ্ এক বিবৃতিতে বলেন, শক্তি উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি যত দ্রুত সম্ভব চালু করার তাগিদ ও সেটাকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রযুক্তিতে পরিণত করার মাঝে একটা, 'মৃত্যু উপত্যকা' থেকে যায়। তিনি আরও বলেন যে, প্রাথমিক স্তরে বেশি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি আবিষ্কারের বড় সাফল্য অর্জন এবং তারই মাধ্যমে পরবর্তীকালে নয়া শক্তির খরচ কমিয়ে আনাই তাদের লক্ষ্য।

আমেরিকার রিপাবলিকান দলের নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, কার্বন নির্গমনের সঙ্গে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রচারের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বলেছেন, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি মেনে চলার পুরোপুরিভাবে আইনি বাধ্যবাধকতা নেই, যা মার্কিন কংগ্রেস পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছে। বাস্তবত প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে সিদ্ধান্ত মানার বাধ্যবাধকতা না থাকায় এবং পুণর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের শপথ গ্রহণ হওয়ায় সবুজ সাম্রাজ্যবাদী ও ফসিল ফুয়েলের কতৃত্বকারী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। (সারণি - ২ দ্রষ্টব্য)

প্যারিস সম্মেলনের পূর্বে

বিগত তিন দশকের বেশি সময় ধরে, রাষ্ট্রসংঘের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপিসিসি'র পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে যে, মানব সভ্যতায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য দায়ী। আর এই বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলেই পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে যা অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সহ বহু প্রজাতির বিনাশ ঘটাবে। বৃটিশ আবহাওয়াবিদ, বিভিন্ন এনজিও এবং আইপিসিসি'র মতে, তাদের এই ভবিষ্যত বাণীর বহু ইঙ্গিত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যেমন

১) আইপিসিসি'র তৃতীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবে, দুকোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে।

২) পশ্চিবঙ্গের সুন্দরবনে গঙ্গার মোহনায়, ঘোড়ামারা দ্বীপ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

৩) আইপিসিসি'র এক সময়কার সভাপতি রাজেন্দ্র পাচৌরি বলেছেন ভারতের হিমালয়ের হিমবাহগুলি ২০৩৫ সালের মধ্যে গলে শেষ হয়ে যাবে।

৪) বর্তমানে, হুদহুদ, এলনিনোর কারণ স্বরূপ বিশ্ব উষ্ণায়ণকেই দায়ী করা হয়েছে।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলিকে প্রতিরোধ করতে এবং ইতিমধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, ১) বর্তমান উৎপাদন প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব হ্রাস করা হয় এবং ২) বিকল্প কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এই উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালের সম্মেলনে এমন একটা তহবিল গঠনের প্রস্তাব ওঠে, ২০১০ সালে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় এবং ২০১১ সালে তহবিল গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত খসড়া তৈরী করা হয়। ২০১১ সালে ডারবান সম্মেলনে এই ফান্ডের একটি ২৪ সদস্যের পরিচালন পর্ষদও গঠন করা হয়। ফান্ডের লক্ষ্য স্থির হয় ২০২০ সালে পৌঁছে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির জন্য প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার বন্দোবস্ত করা। প্যারিস সম্মেলনের পূর্বে, ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী এ তহবিলের আয়তন মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলার।

এরও পূর্বে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অস্থায়িত্বের আশঙ্কাকে সামনে রেখে গড়ে তোলা হয় গ্লোবাল এনভাইরনমেন্টাল ফ্যাসিলিটির মত (GEF) পরিবেশ উন্নয়ন তহবিল ব্যবস্থা।

জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকাকে নস্যাৎ করে, এনথনি ওয়াসির, "জলবায়ু পরিবর্তন, জলচক্রের দ্বারাই প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা নয়" শীর্ষক রচনায়

সারণি-২
প্রধান প্রধান পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সূচক

		সূচনা ২০০৪	২০১৩	২০১৪
বিনিয়োগ পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও জ্বালানিতে নতুন বিনিয়োগ (বার্ষিক)	বিলিয়ন	৪৫	২৩২	২৭০
শক্তি (বিদ্যুৎ)				
পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা (মোট, এর মধ্যে জলবিদ্যুৎ নেই)	গিগাওয়াট	৮৫	৫৬০	৬৫৭
পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা (মোট, জলবিদ্যুৎ ধরে)	গিগাওয়াট	৮০০	১৫৭৮	১৭১২
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মোট)	গিগাওয়াট	৭১৫	১০১৮	১০৫৫
জৈববিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	গিগাওয়াট	< ৩৬	৮৮	৯৩
ভূগর্ভের তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের (জিওথার্মাল) ক্ষমতা	গিগাওয়াট	৮.৯	১২.১	১২.৮
সৌর ফোটোভোল্টেইক উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	গিগাওয়াট	২.৬	১৩৮	১৭৭
[সূর্যের তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা (কনসেনট্রেটিং সোলার থার্মাল পাওয়ার)	গিগাওয়াট	০.৪	৩.৪	৪.৪
বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা	গিগাওয়াট	৪৮	৩১৯	৩৭০

সূত্র ঃ REN 21 - 'পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ২০১৫ ঃ বিশ্বের অবস্থান সংক্রান্ত প্রতিবেদন'।

আইপিসিসি'র জলবায়ু মডেলকে "মাছি তাড়াতে কুকুরের ছুটোছুটির মডেল" রূপে ব্যাখ্যা করেন। এখানে অবশ্যই মাছি হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কুকুর হলো জলচক্র। এই রচনায়, আইপিসিসি'র দ্বারা প্রচারিত, মনুষ্যজনিত কারণে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসই, বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পের পজিটিভ ফিডব্যাকের জন্য দায়ী, এই বক্তব্য খন্ডিত হয়।

আইপিসিসি'র বক্তব্যের বিপরীতে বাস্তবে যা পাওয়া যায় ঃ

১) গত ৩০ বছরের উপগ্রহ চিত্র তুলনা করে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে ১০০০ বর্গ কিমি জমি বেড়ে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর বয়ে আনা পলি ঐ জমি তৈরী করেছে। বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের মতে উপকূল অঞ্চলে বাঁধ দিয়ে আরও ৫০০০ বর্গ কিমি জমি পাওয়া যেতে পারে।

২) একদল নদী বিশেষজ্ঞর মতে ঘোড়ামারা দ্বীপ ক্রমশ তলিয়ে যাওয়ার কারণ নদীর নিজস্ব গতিপ্রকৃতি। প্রাকৃতিক কারণে ঘোড়ামারা দ্বীপের নিকটে নয়াচর দ্বীপের আয়তন গত দু দশকে দ্বিগুণ হয়েছে।

৩) হিমালয়ের হিমবাহগুলির অস্বাভাবিক গলন বিষয়ে রাজেন্দ্র পাচৌরির ভিত্তিহীন গল্পের বিপরীতে, ওয়াদিয়া

ইন্সটিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির ডাইরেক্টর এ কে দুবে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে হিমালয়ের হিমবাহগুলি যথেষ্ট নিরাপদে আছে এবং সেগুলির কোনো অস্বাভাবিক গলন হয় নি।

বৃটিশ ওয়েদার অবজারভেটরি স্টাডিজ কর্তৃক বিগত ১৪৩ বছরের বেশি সময় ধরে উত্তরাখন্ডের আলমোড়ার কাছে মুক্তশ্বর গবেষণা কেন্দ্রে তাপমাত্রা হিসাব করে দেখা গেছে যে এই সময়কালে ঐ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াস কমেছে।

বিবিসি'র আবহাওয়া বিষয়ক প্রতিনিধি পল হাডসন মজা করে বলেছেন, "ভূ-তাপমাত্রা সংক্রান্ত পূর্বাভাসগুলি ভূ-উষ্ণায়ণের চেয়েও উত্তপ্ত।"

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রথম যুগান্তকারী পরিবর্তন ছিল, বিপর্যয়ের পরে, "গৃহীত ব্যবস্থা ও ত্রাণ" থেকে "প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি" কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ। দ্বিতীয় যুগান্তকারী পরিবর্তনটি ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জকে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দান। এতে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল –

১) বিপর্যয় ও ঝুঁকির মোকাবিলা, ২) মানুষের অসহায় অবস্থা দূর করা, ৩) পরিবেশ জ্ঞান সমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৯০-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্র সংঘের আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়হ্রাস দশকে, বিপর্যয় মোকাবিলায়, কারিগরি-কৌশলের উপর জোর দেওয়া হয় আর্থসামাজিক গোষ্ঠী ভিত্তিক অসমতা দূর করার উপর। সুরক্ষিত পৃথিবীর লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের বিশ্ব সম্মেলনে 'ইয়োকোহামা' কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনায় স্পষ্টতই বিপর্যয় হ্রাস ও সুস্থিত উন্নয়নের ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ২০০৬ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাদের রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব, বিশেষত দরিদ্র মানুষের উপর কিভাবে পড়তে পারে তা ব্যাখ্যা করে। প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা না করতে পারা সুরক্ষার অভাবের মধ্যে পড়ে। মোকাবিলা বলতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা থেকে সহনশীলতা সব কিছুই বোঝায়।

বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক স্তর থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজ্য থেকে জেলাস্তরে বন্টিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা স্বীকার ক'রে ভারত সরকার তার আই এন ডি সি'তে (INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION) ২০৩০ সালকে সামনে রেখে তিনটি অঙ্গীকার করেছে ঃ

১) ২০০৫ সালকে ভিত্তি করে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩৩-৩৫% কার্বন নির্গমন কমাবে।

২) অজৈব জ্বালানি ব্যবহার করে মোট বিদ্যুতের ৪০% উৎপাদন করবে।

৩) বনসৃজনের মাধ্যমে ২৫০-৩০০ কোটি টন কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, গ্রিন হাউস গ্যাস, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতির প্রভাব নিষ্ক্রিয় করবে।

ভারতের আইএনডিসি'তে, পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তি না বলে, 'অজৈব জ্বালানি' শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির ইঙ্গিত। এখানে কয়লাকে দূষণমুক্ত জ্বালানির উৎস রূপে গণ্য করা, আগামীতে, 'কার্বন পৃথকীকরণ' প্রযুক্তি প্রয়োগের ইঙ্গিত বহন করে। ভারতে ১০০টি স্মার্ট সিটিকে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধী রূপে গড়ে তোলা, উপযুক্ত জনপরিহন ব্যবস্থার বিকাশ এবং অন্যান্য সব প্রয়াসের কথাও বলা হয়েছে। এই মুহূর্তে একমাত্র ভারতেই পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তির জন্য আলাদা একটি মন্ত্রক রয়েছে। যার নাম 'নতুন ও পুণর্নবীকরণ শক্তি মন্ত্রক'। ২০২০ সালের মধ্যে যাতে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১৫% পুণর্নবীকরণ যোগ্য উৎসগুলি থেকে আসে, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনায় অপ্রচলিত শক্তির মিশ্রণ বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করা হয়েছে। দুর্গাপুরে স্মার্ট সিটি সংক্রান্ত আলোচনা এবং 'স্মার্ট দুর্গাপুর' অ্যাপ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব, দেবাশিস সেন জানান লগ্নি টানতে, শহরগুলিতে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়া হবে, শহরগুলি ঘেরা হবে পর্যাপ্ত সবুজে এবং সৌরশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

নতুন প্রযুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার নামে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির আবির্ভাব ও উন্নতি ঘটানো হয়েছে এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা চলছে। যেমন ঃ

কার্বন পৃথকীকরণ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বায়ুমন্ডল ও বড়মাপের মানব সৃষ্ট উৎসগুলি [শোধনাগার, বিদ্যুৎ, কয়লা ও গ্যাস, ইথানল, সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র] থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য সঞ্চয় করে, পরবর্তীকালে ব্যবহার করা যায়। কার্বন ডাই অক্সাইড পৃথকীকরণের বিভিন্ন প্রযুক্তিগুলি হলো –

১) দূষণহীন কয়লা প্রযুক্তি ঃ কয়লা ভিত্তিক যে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা দহনের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পূর্বেই কয়লাকে সিন গ্যাসে অথবা তরল জ্বালানিতে রূপান্তরিত করা হয়। সিন গ্যাসে মূলত কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন থাকে। এই হাইড্রোজেনই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড আবদ্ধ করার জন্য, 'হাইড্রোজেন মেমব্রেন রিফর্মিং', 'ইন্টিগ্রেটেড গ্যাসিফিকেশন কম্বাইন্ড সাইকেল' সহ শিফট গ্যাস রিঅ্যাকশন এবং 'ফিশার ট্রপিক' এর মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।

দহনের পরে ধোঁয়া নির্গমন নলের বিভিন্ন গ্যাসের মধ্য থেকে কার্বন-ডাই অক্সাইডকে পৃথক করা হয়। অ্যামাইন যৌগ ব্যবহার করে রাসায়নিকভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড পৃথকীকরণের প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয় বহুল হওয়ায় পলিমেরিক মেমব্রেন বা অন্যান্য শোষকের ব্যবহার এবং ন্যান টিউবকে কাজে লাগানোর কথাও ভাবা হয়েছে।

দহনের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড আবদ্ধ করণের – দুই ধরনের প্রযুক্তির সম্ভাবনা –

ক) সুপার ক্রিটিক্যাল ও আলট্রা 'ক্রিটিক্যাল বয়লারে - যেখানে কয়লার দহন অনেক কার্যকরী ভাবে হয় – সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের হার হ্রাস করা যায়।

খ) অক্সি জ্বালানি দহন ও রাসায়নিক লুপিং এর মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেখানে ধোঁয়া নির্গমন নলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেশি হয় সেখানেও কার্বন আবদ্ধ করার প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায়।

দেখা গেছে শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ও গাদ (স্ল্যাগ) কার্বন-ডাই অক্সাইডের ভালো শোষক হিসাবে কাজ করতে পারে।

২) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ও জৈবিকভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড পৃথকীকরণ ঘটায়, এই প্রক্রিয়ার সময়কাল স্থায়ীভাবে বাড়ানো বা বিভিন্ন শৈবাল ও কার্বনিক অ্যানহাইড্রেট উৎসেচককে অনুঘটক রূপে ব্যবহার করে মাইক্রো মেডিয়েটেড কার্বন পৃথকীকরণের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়েও বিভিন্ন গবেষণা চলছে।

৩) সামুদ্রিক সাইনোব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড আবদ্ধ করতে, ফাইটোপ্ল্যান্টেন তথা সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে, পজিটিভ ক্যাটালিস্ট স্বরূপ সমুদ্রের উপরিতলে লোহার গুঁড়ো ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। আবার বিভিন্ন সামুদ্রিক অঞ্চলে, কার্বন ডাই অক্সাইডকে, অনুঘটক রূপে ব্যবহার করে সমুদ্রের উর্বরতা বৃদ্ধির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কার্যকারিতা সফলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

৪) প্রাকৃতিকভাবে সমুদ্রই, কার্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চয়ের সবচেয়ে বড় ভান্ডার, কিন্তু সমুদ্রের কোন গভীরতায়, কার্বন ডাই অক্সাইড, ঢোকানো হচ্ছে তার উপর সঞ্চয়ের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। ৩০০ মিটারের কম গভীরতায় হলে – তার অনেকটাই পুনরায় বায়ুমন্ডলে ফিরে আসে, ১০০০ মিটার গভীরতায় ঢোকানো হলে, বায়ুমন্ডলে ফিরে আসতে সময় লাগে। ৩০০০ মিটার গভীরতায় তরল কার্বন ডাই অক্সাইড ঢোকানো সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ তরল কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব, সমুদ্রের জলের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি হওয়ায় তা সমুদ্রের তলদেশে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকে। এই রূপ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সাফল্য পেয়েছে নরওয়ের "স্লিপনার" প্রকল্প। ১৯৯৬ সাল থেকে এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিবছর ভূগর্ভের নোনা জলস্তরের নিচে ১ মিলিয়ন টন করে কার্বন ডাই অক্সাইড ঢোকনো হয়েছে। ভূগর্ভে ৩০৪.১°K তাপমাত্রা এবং ৭৩.৮ বার চাপে সুপার ক্রিটিক্যাল পর্যায় এই সঞ্চয় করা হয়েছে।

ভূ-ত্বক ও ভূগর্ভের গঠনগত চরিত্র সর্বত্র এক না হওয়ায়, বিজ্ঞানীদের মতে ভূগর্ভে কার্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চয়ের পূর্বে নির্দিষ্ট অঞ্চলের জিওমরফোলজিক্যাল বিষয়টি বিবেচনা করে নিতে হবে। এছাড়া, ভূগর্ভে যে কার্বন ডাই অক্সাইড ঢোকানো হয়েছে তা নিরাপদ সঞ্চয় হচ্ছে কিনা তার জন্য ভূ-কম্পন সংক্রান্ত থ্রিডি সিসমিক স্টাডির তথ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এর দীর্ঘ মেয়াদি ফলাফল লক্ষ্য করেই এই প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো যেতে পারে।

৫) সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায়, কার্বন ডাই অক্সাইড নিষ্ক্রিয় হলেও, উপযুক্ত চাপ ও তাপমাত্রায় এবং উপযুক্ত অনুঘটকের ব্যবহারের মাধ্যমে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ইথানল ও মিথানলের মত জ্বালানি অথবা সার উৎপাদন করা যেতে পারে। কার্বনেটেড পাণীয় তৈরী ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়।

কার্বন ডাই অক্সাইড, পৃথকীকরণের উপরোক্ত প্রযুক্তিগুলি বাণিজ্যিকভাবে লাভ জনক হবে বলে এখনো প্রমাণিত হয় নি।

৬) কার্বন ডাই অক্সাইড পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায়, আরও বেশি খনিজ তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে, পকিল্পনামাফিক কার্বন ডাই অক্সাইড, ভূগর্ভের নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঢোকানো হলে, তেল ভান্ডারে তেলের ঘনত্ব ও সান্দ্রতার যে পরিবর্তন ঘটবে, তাতে শক্তি উৎপাদনের জন্য বাড়তি জ্বালানি মিলবে। তৈলক্ষেত্রের মত খনন অযোগ্য কয়লা স্তরে কার্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চয় করা যেতে

পারে। সাধারণভাবে কয়লা, কার্বন ডাই অক্সাইডের তিনটি অণু শোষণ করে নেয় এবং তার পরিবর্তে মিথেনের একটি অণু স্থানচ্যুত হয়। এই প্রক্রিয়া জারি থাকলে কয়লা স্তর থেকে মিথেন উদ্ধারের সম্ভাবনা অনেক বাড়বে। এ বিষয়ে আমেরিকা, চীন, জাপান, ভারত এবং কয়েকটি দেশে ব্যাপক গবেষণা চলছে। এই প্রযুক্তিই সবচেয়ে লাভজনক হতে পারে বলে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে।

প্যারিস সম্মেলনে, নতুন প্রযুক্তিকে লাভজনক করে তোলার প্রচেষ্টায় পুঁজি বিনিয়োগের শপথ, প্রকৃতপক্ষে ফসিল ফুয়েল ও গ্রিন লবি উভয় পক্ষের মধ্যে, 'শক্তি সম্পদের' বাজার বন্টনের বিষয়ে একটা আপাত সমঝোতা হয়েছে।

আইপিসিসি'র পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছে, শিল্প-বাণিজ্য ও গৃহস্থালির নানান কাজে পরিবেশ যে হারে দূষিত হয়েছে তা পরিবেশের মধ্যে দূষণ প্রতিহত করার যে সহজাত ক্ষমতা রয়েছে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক স্তরে সুসমন্বিত নানা প্রয়াসের মাধ্যমে, বায়ুদূষণ ও গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির ক্ষতিকারক দিকগুলি মোকাবিলা করার দুটি প্রয়াস হলো –

১) স্টেট অ্যান্ড টেরিটোরিয়াল এয়ার পলিউশন প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (STAPPA)

২) অ্যাসোসিয়েশন অফ লোকাল এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল অফিশিয়ালস।

বায়ু দূষণ ও গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির নির্গমন হ্রাস করতে মেন অফ হাব্রমোনাইড অপশনস তৈরী করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি মোকাবিলা করার জন্য প্রথমেই প্রতিটি শিল্প, বাণিজ্য ও গৃহস্থালী সংক্রান্ত কাজকর্মের ফলে কতটা কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে মিশছে (যাকে কার্বন ফুট প্রিন্ট বলা হয়) এবং প্রাকৃতিক সহায় সম্পদ কতটা নিঃশেষিত হচ্ছে (যাকে ইকলজিক্যাল ফুট প্রিন্ট বলা হয়) – তার যথাযথ পরিমাপ করার কাজ ও বিশ্লেষণের কাজ মার্কিন এনভায়রনমেন্টাল এজেন্সি এবং ওয়াটার ইউটিলিটি ক্লাইমেট অ্যালায়েন্স শুরু করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিভিন্ন পরিকল্পনার লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণের কাজও শুরু করা হয়েছে। স্থানীয় স্তরে বিশেষত শহরাঞ্চল বা শিল্পাঞ্চলে, আশেপাশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাকে হিট আইল্যান্ড এফেক্ট বলা হয়। পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতির সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাবে, জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রও বিপর্যস্ত হতে পারে বলে প্রচার করা হয়েছে।

পরিবেশে তথা জলবায়ু বিষয়ক পরিকল্পনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়, জলবায়ুকে স্থিতিশীল রাখার প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা কার্যকরী করার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। সুতরাং আমাদের জানা দরকার পৃথিবীর জলবায়ু অর্থাৎ তাপমাত্রা, বায়ুর উপাদান, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি কি চিরকাল একই রকম ছিল?

সৌরমন্ডলের মধ্যে পৃথিবীর সুনির্দিষ্ট অবস্থানের জন্যই পৃথিবীতে যে বায়ুমন্ডল ও জলমন্ডল গড়ে উঠেছে তা জীবজগতের পক্ষে উপযোগী। পৃথিবীর বুকে এখন যে বায়ুমন্ডল দেখা যায় তা কি চিরকালই আজকের মত ছিল ? উত্তর হল না। সময়ের সাথে সাথে তার মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, চাপ, গ্যাসীয় উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে, সমুদ্রতল ওঠানামা করেছে (চিত্র ১ এবং ২)। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং জীবজগতেও পরিবর্তন হয়েছে।

বর্তমানে বায়ুমন্ডলের প্রধান দুটি উপাদান হল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এছাড়া আছে সামান্য পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প এবং ওজোন গ্যাস। এই গ্যাসগুলি প্রধানভাবে বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বা তার উপরে সৌর বিকিরণের প্রভাবে ফটোলাইসিস বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীতে আদি বায়ুমন্ডল সৃষ্টি হয়েছিল মূলত তিনটি প্রক্রিয়ায় ঃ (১) সৌর নেবুলা থেকে পৃথিবী সৃষ্টির পর বাকী গ্যাসীয় উপাদান থেকে (২) মহাবিশ্বের অন্যত্র থেকে আসা (উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি) উপাদান থেকে এবং (৩) অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত গ্যাস থেকে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে পৃথিবী সৃষ্টির পর প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ হেডিয়ান ও আর্কিয়ান যুগের প্রথম পর্যায়ে বায়ুমন্ডলে ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড এবং অল্প পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং নাইট্রোজেন। সময়ের সাথে সাথে বায়ুমন্ডলে গ্যাসীয় উপাদানগুলির পরিমাণ ও উপাদানের সংখ্যা বেড়েছে।

আদিম পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন গ্যাস উৎপত্তি হল কিভাবে ? প্রধানতঃ তিনভাবে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে ঃ (১) আলোক সংশ্লেষের আলোক দশায় ফটোলাইসিস বিক্রিয়ায় জলের অণুর ভাঙণের ফলে। (২) বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে জলীয় বাষ্প কণার ফটোলাইসিস প্রক্রিয়ায়। (৩) সামুদ্রিক জল ও মাটিতে থাকা সালফেট ও কার্বোনেট যৌগের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পৃথিবীর সৃষ্টির সময় এবং তার প্রায় ২৫০ কোটি বছর বা আরও

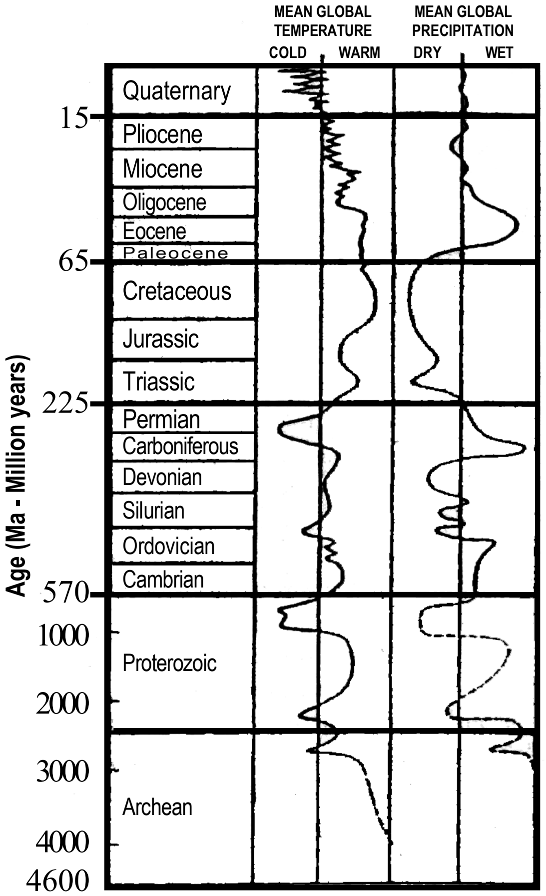

চিত্র - ১ ঃ পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য। সূত্র : Earth as an Evolving Planetary System - Kent C. Condie (2005)

বেশি সময় ধরে সবাত শ্বসনকারী উদ্ভিদের উপস্থিতি ছিল না। তাই বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ভর করত উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণের জন্য। অগ্নুৎপাত বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পকণার হারকে প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বলে অগ্নুৎপাতের হারও এই কারণে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন সৃষ্টির অপ্রত্যক্ষ কারণ।

পৃথিবীর জন্মের প্রায় ১০০ কোটি বছর পর অর্থাৎ আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছর আগে প্রথম জীবের সৃষ্টি হয় সমুদ্রে। অজৈব পদার্থ থেকে এই জৈব পদার্থ কিভাবে বা কেন সৃষ্টি হয়েছিল তার সম্পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্বে না এলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে তৎকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশে বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় পদার্থগুলির বিক্রিয়ার ফলেই প্রথম এককোষী জীব সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলার তৎকালীন পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে উপস্থিত গ্যাসীয় পদার্থ যেমন মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্পকে নিয়ে পরীক্ষাগারে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে এক রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করেন যার নাম অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড হল সমস্ত প্রোটিন জাতীয় পদার্থের মৌলিক একক, যা জীবের গঠন, বেঁচে থাকা এবং প্রজননের প্রধান উপাদান। আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে বায়ুমন্ডলের অজৈব উপাদান থেকেই সমুদ্রে প্রথম এককোষী জীবের সৃষ্টি। সামুদ্রিক চুনাপাথর, ফসফেট এর মধ্যে ৩৫০ কোটি বছর আগেকার স্ট্রোমাটোলাইট (ট্রেস ফসিল) পাওয়া গেছে যা এককোষী প্রাণীর চিহ্ন বহণ করে। লৌহ আকরিকে এমন এককোষী প্রাণীর চিহ্ন পাওয়া গেছে যার বয়স ২৫০ থেকে ১৮০ কোটি বছর আগেকার। প্রথম এককোষী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয় ১০০ কোটি বছর আগে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন, জীবের বিবর্তন এবং প্রধান প্রধান বিলুপ্তির যুগকে এখন সংক্ষেপে দেখা যাক।

● আজ থেকে প্রায় ৪৫৬ কোটি বছর আগে সোলার নেবুলা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

● আজ থেকে ৪৫১ কোটি বছর আগে চাঁদের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৯০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে উল্কাপাত হয়।

● আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছর আগে সমুদ্রে প্রথম এককোষী জীবের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৪০ কোটি বছর আগে প্রথম মাইক্রোফসিল ও স্ট্রোমাটোলাইট পাওয়া যায়।

● আজ থেকে ২৭০ কোটি বছর আগেকার প্রথম রাসায়নিক ফসিল প্রমাণ করে উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ বিক্রিয়ার সূচনা।

● আজ থেকে ২৫০ কোটি বছর আগে প্রাচীন মহাদেশগুলির গঠন সম্পূর্ণ হয়।

● আজ থেকে ২৫০-১৮০ কোটি বছর আগে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা পর্যাপ্ত হয় এবং বায়ুমণ্ডল সবাত শ্বসনের পক্ষে উপযুক্ত হয়।

● আজ থেকে ২২০ কোটি বছর আগে উন্নত নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ১৮০ কোটি বছর আগে সামুদ্রিক শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

● আজ থেকে ১০০-৭০ কোটি বছর সময়কালে পৃথিবীতে অমেরুদন্ডী প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৫৮ কোটি বছর আগে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বিপুল হারে দ্বিতীয় বার বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী জুড়ে নানা প্রকার বহিঃকঙ্কাল বিশিষ্ট অমেরুদন্ডী প্রাণীর যেমন ট্রাইলোবাইট, গ্র্যাপটোলাইট ইত্যাদির জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৫৪.২ কোটি বছর আগে অমেরুদন্ডী প্রাণীগুলি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

● আজ থেকে ৫৩ কোটি বছর আগে প্রথম মরুদন্ডী প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৪৭ কোটি বছর আগে মহাদেশীয় উদ্ভিদের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৪৩.৩ কোটি বছর আগে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি, সমুদ্রতলের বিশাল পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটে।

● আজ থেকে ৪২ কোটি বছর আগে মহাদেশীয় প্রাণীর প্রথম জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৪১ কোটি বছর আগে ভাসকুলার প্লান্ট-এর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৭ কোটি বছর আগে প্রথম উভচর প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৫.৯ কোটি বছর আগে আবার বহু সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বিলুপ্তি ঘটে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানিয়ে নিতে না পারার জন্য।

● আজ থেকে ৩৩ কোটি বছর আগে প্রথম সরীসৃপের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩১ কোটি বছর আগে প্রথম পতঙ্গের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ২৫.১ কোটি বছর আগে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিলুপ্তি ঘটে।

● আজ থেকে ২১.৫ কোটি বছর আগে প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ২১ কোটি বছর আগে প্রথম সপুষ্পক উদ্ভিদের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৬.৫ কোটি বছর আগে ডাইনোসর, অ্যামোনাইট সহ প্রচুর মেরুদন্ডী, অমেরুদন্ডী প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের বিলোপ ঘটে।

● আজ থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগে প্রথম মনুষ্যজাতীয় (হোমিনিড) প্রাণীর জন্ম হয়।

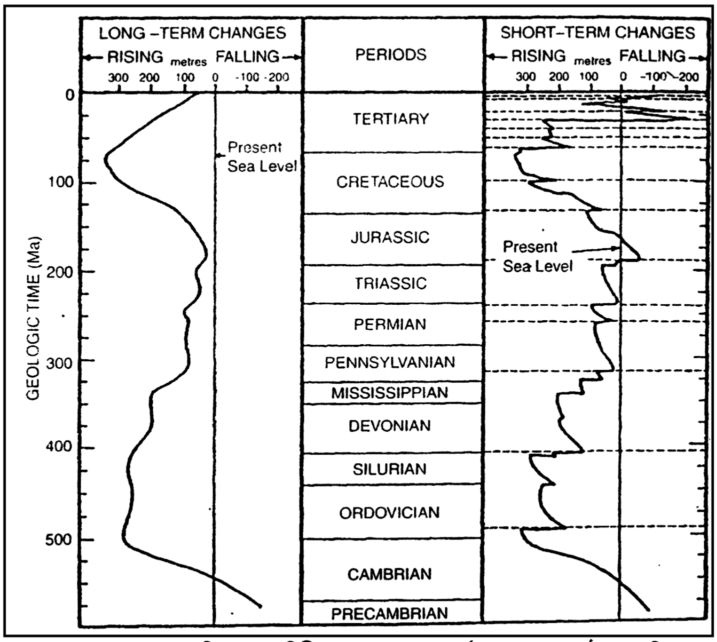

চিত্র - ২ ঃ পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত সমুদ্র তলের ওঠানামার চিত্র। সূত্র : Earth as an Evolving Planetary System - Kent C. Condie (2005)

● আজ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে আধুনিক মানুষ হোমোসেপিয়ান-এর জন্ম হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীর পরিবেশ জীব বসবাসের উপযুক্ত হওয়ার পরই জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রথম উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ছিল অবাত শ্বসনকারী কারণ তখন বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের অভাব ছিল। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা পর্যাপ্ত হওয়ার পরই সবাত শ্বসনকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। জীব সৃষ্টির পরে বহুবার প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে এবং জীবকূল এই পরিবর্তনের সাথে নিজেদের অভিযোজিত করেছে। যারা পারে নি তারা অবলুপ্ত হয়েছে। এটাই প্রকৃতির শাসন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের এই পরিবর্তনের মূল কারণ শক্তির ভারসাম্যের সমীকরণের পরিবর্তন। জীবজগতে সকল শক্তির উৎস সূর্য। সূর্য সাপেক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আপেক্ষিক অবস্থান বিভিন্ন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আগত সৌরশক্তির উপর নির্ভর করে উৎপাদক ও নানাবিধ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যকার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তির প্রবাহ ঘটে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনচক্রগুলি জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। সূর্য থেকে আগত শক্তি শোষণ

করার পর পৃথিবী থেকে বিকিরিত শক্তির একটা অংশ বায়ুমন্ডলের গ্রীণহাউস গ্যাসগুলির দ্বারা আবদ্ধ থাকায় পৃথিবী জীব বসবাসের উপযুক্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্রীণ হাউস এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীর বর্তমান গড় তাপমাত্রা হত – ১৮° সেলসিয়াস, যা জীবজগতের বসবাসের পক্ষে অনুপোযুক্ত। সুতরাং পরিবেশে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীণহাউস গ্যাসগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং বিভিন্ন জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌল ও যৌগগুলির ভারসাম্য রক্ষা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনভাবে (ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, উল্কাপাত, বহির্বিশ্বের কোনও ঘটনা) শক্তির (পরিমাণের) পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ শক্তি সংযোজিত বা বিয়োজিত হলে শক্তির ভারসাম্যের নতুন সমীকরণ গঠিত হয় এবং সম্পর্কিত জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্রগুলির (বায়ো-জিও-কেমিক্যাল সাইকেল) পর্যায়কাল, স্থায়িত্ব, চক্রের মধ্যবর্তী কোন কোন মৌল বা যৌগের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবজগৎ ও নিজেদের অভিযোজিত করতে থাকে। পরিবেশের পরিবর্তনের মাত্রা জীবজগতের যে যে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করার বাইরে চলে যায় – তারা বিলুপ্ত হয়। আর যারা অভিযোজনে সক্ষম হয় তারা টিঁকে যায়। দেখা গেছে গ্লোবাল কুলিং পর্যায় প্রজাতির বিনাশের হার বেশি। প্রাকৃতিকভাবেই বর্তমানে ‘বিশ্বউষ্ণায়ণ’ পর্যায় চলছে। ২০১৫ সালের খবরে প্রকাশ হিমালয় অঞ্চল ও আমাজন অববাহিকায় কয়েক শত নতুন প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। অতি সম্প্রতি ‘ইলাইফ’ পত্রিকায়, এক গবেষণাপত্রে, প্রকাশিত হয়েছে যে জীবের বিবর্তনের জন্য অর্থাৎ নতুন প্রজাতির সৃষ্টির জন্য, ‘মিউটেশনই’ প্রধান, প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ নয়।

জলবায়ুর ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, জলবায়ু সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল এবং তারই নিরীখে ভূ-জৈব চক্রগুলিও গতিশীল সাম্যে বিরাজ করে।

জলবায়ু সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাগুলি থেকে দেখা যায় যে, যে ধারণাকে ভিত্তি করে ‘কার্বন বাজেট’ নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে কারণকে ফল এবং ফলকে কারণ রূপে হাজির করা হয়েছে। এই নিরীখে পরবর্তী প্রতিটি প্রকল্পেরই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তথাপি, আন্তর্জাতিকভাবে, ‘জলবায়ু স্থিতিশীল’ রাখার প্রচার অর্থাৎ মনুষ্যজনিত কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে – নচেৎ ঘটত না। এসব প্রচারের একটা দার্শনিক লক্ষ্য আছে। যা হলো বিজ্ঞান বিরোধী। বস্তুগতভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে শুধু জলবায়ু নয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সময়ের সাপেক্ষে গতিশীল সাম্যের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন ঘটে চলে। যেমন গ্রহ-নক্ষত্রগুলির আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের ভর, মহাকর্ষ বলের পরিবর্তন ঘটে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর মহাদেশগুলির অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে মানব সমাজও পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ কোনো কিছুই শাশ্বত নয়। বিজ্ঞান শ্রেণী নিরপেক্ষ হলেও, দর্শন শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। তাইতো, বাজার দখলের লড়াইয়ে এক সাম্রাজ্যবাদী লবি যখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ অপবিজ্ঞানকে প্রচার করে, তখন বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপ কিন্তু সেই অপবিজ্ঞানের স্বরূপ উন্মোচন করেনি। কেননা এই অপবিজ্ঞান প্রচারের, দার্শনিক ভিত্তি সকল সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করে। সকল সাম্রাজ্যবাদী গ্রুপের সাধারণ শ্রেণী স্বার্থ হল, মৃতপ্রায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখা, যা বিপন্ন হলে পুঁজিপতিদের অস্তিত্বই বিলোপ হবে। পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরে আজ যে ভূমন্ডলীয় অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছে তা পুঁজিবাদকে অতি উৎপাদনের সংকট থেকে মুক্তি দিতে তো পারেই নি বরং তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই অতি উৎপাদন হলো বাজারের চাহিদা অপেক্ষা অধিক উৎপাদন, কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের প্রয়োজনের নিরীখে নয়। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শিল্পীয় উৎপাদন বিকাশে শক্তির উৎস স্বরূপ জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প পুণর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস হতে পারে না। তথাপি, পরিবেশ রক্ষার নামে, পুণর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পের বিকাশ আর সম্ভব নয় – একথাই ঘোষণা করে। **তাই শিল্পীয় বিকাশের গতি হ্রাস করতেই, ‘নিরীহ কার্বন ডাই অক্সাইড’ গ্যাসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।** বিশ্বব্যাপী শিল্পের মন্দায়, পুঁজিপতি শ্রেণী কৌশল বদলে, অনুৎপাদক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। অনুৎপাদক ক্ষেত্রের জন্য পুণর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ব্যবহারই যথেষ্ট। এই নিরীখেই পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করা খুব জরুরী নয়। তাই পরিবেশবাদীরা পরিবেশ রক্ষার নামে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে পারে এবং তা বন্ধ করে দিতে পারে। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে, সবুজের ঘেরাটোপ ভেঙ্গে যে শিল্পের বিস্তার ঘটেছিল, তা বাজারের মধ্য দিয়ে সামন্ত ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক জনসাধারণের কর্মসংস্থান জুগিয়েছিল। আজ আবার দীর্ঘস্থায়ী মহামন্দার যুগে পুঁজিপতিশ্রেণী, শিল্প’কে সবুজে ঢেকে

কিছুটা নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। কিন্তু সমাজ বিকাশের বিরোধিতা করে তা কি সম্ভব? মনে রাখা দরকার সামন্ত সমাজে, 'সবুজ' ছিল প্রকৃতির শাসন। আর, পুঁজিবাদী যুগে 'সবুজ' হলো পুঁজির শাসন। যে সকল বুদ্ধিজীবী ও পরিবেশবাদীরা বর্তমান 'সবুজ পৃথিবী'র পক্ষে ওকালতি করছেন তারা কি জানেন যে মুনাফার লক্ষ্যে বিনিয়োগ না সমাজ, না পরিবেশ কোনটারই মঙ্গল কামনায় হয় না। যদি সমাজ-কল্যান মূলক হতো তবে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাগুলির বাস্তব প্রয়োগ ঘটতো। শিল্প কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রিত হতো। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় প্রতিটি প্রকল্পে বারে বারে আলোচিত হয়েছে যে নতুন প্রযুক্তিগুলি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে কিনা কারণ সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ মানবকল্যাণ বিষয়টি গৌণ। বাজারের স্বার্থরক্ষা করতে, 'মানব কল্যাণ'কে সামাজিক স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিণত করা হয়েছে। ব্যাক্তিগতভাবে যার ক্রয়ক্ষমতা আছে সে 'মানব কল্যান' ক্রয় করতে পারবে!

বিশ্বজুড়ে সমাজ অর্থনীতির এরূপ অবস্থায়, সমাজ বিকাশের নিয়মানুযায়ী পুঁজিবাদের অতি উৎপাদনের সংকট কাটিয়ে উৎপাদন বিকাশের ধারা বজায় রাখতে সমাজবাদী সমাজ আসন্ন। তার লক্ষণগুলি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। একমাত্র সমাজবাদী ব্যবস্থায়, সমগ্র জনগণের প্রয়োজনের নিরীখে উৎপাদনই উৎপাদন বিকাশের রূদ্ধদ্বার খুলে দিতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে, 'চির শাশ্বত' বাণী জলবায়ু সমেত সব কিছুকে স্থিতিশীল রাখার আন্তর্জাতিক প্রকল্প, এই সব দার্শনিক ভাব প্রচার, সমাজ বিকাশকে রূদ্ধ করার অপচেষ্টা মাত্র।

আইপিসিসি বিরোধী বিজ্ঞানীরা, আইপিসিসি প্রদত্ত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণকে দেখে হতবাক হয়েছেন। তাই জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রভৃতি প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সম্পর্কে তারা প্রাকৃতিক নিয়ম কানুনগুলিকে বলেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য সাধারণের কাছে পৌছানোর কোনো ব্যবস্থাই জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে করা হয়নি। এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমাজ বিকাশের অন্তরায়গুলিকে অপসারিত না করে, প্রকৃতির আবিষ্কৃত নিয়ম কানুনগুলি সম্পর্কে সাধারণকে ওয়াকিবহাল করা তো যাবেই না বরঞ্চ প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য শিল্পের বিকাশকে দায়ী করে, সমাজ বিকাশের পথে দার্শনিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনের কর্মসূচী ও তার প্রয়োগ কি এরই ইঙ্গিত দেয় না!■

বইমেলায় সমীক্ষণ

গত ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬ সময়কালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে। বিজ্ঞান মনস্ক তার সীমিত সাধ্য নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বইমেলাগুলিতে উপস্থিত থেকেছে। কলকাতার পাটুলি বইমেলা, বেহালা অঞ্চলের দুটি বইমেলা, কলেজ স্কোয়ারে লিটল ম্যাগাজিন মেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর বইমেলা, সুন্দরবনের রাক্ষসখালি মেলা, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ বইমেলা, বর্ধমান জেলার আসানসোল বইমেলা এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি (উত্তরবঙ্গ) বইমেলায় সমীক্ষণ হাজির থেকেছে। বইমেলাগুলিতে পাঠকদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।

পাথরপ্রতিমায় বিজ্ঞানমনস্ক

গত ৫ই মার্চ সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের দুর্গাগোবিন্দপুর গ্রামে স্থানীয় জনকল্যাণ সমিতি'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধিরা 'মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান' এবং 'বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তন' নিয়ে মনোগ্রাহী স্লাইড শো উপস্থিত করেছে। অনুষ্ঠানে 'উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ বেকারত্ববৃদ্ধির কারণ' শীর্ষক বিতর্ক অনুষ্ঠান পরিচালনাও করেছে। অনুষ্ঠানে কয়েকশত গ্রামবাসী গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শুনেছেন। এলাকার মানুষ বিতর্ক অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছেন। এরপর চার্লি চ্যাপলিনের মর্ডান টাইমস চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

জিজ্ঞাসা ও তার সমাধান ঃ

কেন কোনো মশা জিকা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় অথচ এইচ আই ভি বা এরকম মারাত্মক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় না বা তাদের সংক্রমণে ভূমিকা নেয় না?

কোনো মশকী যখন কোনো মানুষের রক্ত চোষণ করে তা তার রক্তে না গিয়ে সরাসরি তার পৌষ্টিক তন্ত্রে চলে যায়। অন্যান্য মশা বাহিত রোগের ন্যায় এইচ আই ভি মশকীর অন্ত্রে প্রতিলিপিকরণ বা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না কারণ এখানে কোনো টি লিম্ফোসাইট থাকে না। ফলে খুব তাড়াতাড়ি তা ভেঙ্গে যায়। এইচ আই ভি পরবর্তী পর্যায়ে সংক্রমণের জন্য মাধ্যম হিসাবে রক্তের প্রয়োজন কিন্তু মশা দ্বারা কোনো জীবাণু সংক্রমণ মশার লালা গ্রন্থির মাধ্যমে হয়। এইচ আই ভি মশার কোনো ক্ষতি করতে পারে না শুধু তাই নয়, মশা দ্বারা এইচ আই ভি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তিতে সংক্রমণ ঘটাতে পারে না। কারণ মশা তার অন্ত্র থেকে কোনো ভাবেই এইচ আই ভি'কে কোনো ব্যক্তির দেহে পুনরায় প্রবেশ করাতে পারে না।

অন্যদিকে ডেঙ্গু, পীতজ্বর বা ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসের মতো জিকা ভাইরাসও মশা দ্বারা সংক্রমিত রোগ। এসব ক্ষেত্রে মশা হল জৈবিক ভেক্টর ও স্তন্যপায়ী প্রাণী হল তার পোষক। জিকা ভাইরাসের ভেক্টর হল এডিস মশকী। এইসব জীবাণুরা এদের জীবনচক্রের কোনো না কোনো দশা মশার দেহে সম্পন্ন করে।

জিকা ভাইরাসের সুপ্তকাল (ইনকিউবেশন পিরিয়ড) হল প্রায় দশদিন। জিকা ভাইরাস মশকীর অন্ত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও পরে লালাগ্রন্থিতে আশ্রয় নেয় এখন তা কোনো মানুষের দেহে সংক্রমণের জন্য প্রস্তুত। জিকা ভাইরাস সাধারণভাবে মানুষের কোনো মারাত্মক জটিল রোগ তৈরি করে না তবে গর্ভবতী মহিলারা এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা খুব ছোট মাথা যুক্ত শিশুর জন্ম দিতে পারে। এই ভাইরাসের প্রতিরোধে এখনও কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। যদিও কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তার দাবি করছে। ■

?

ঃ পাঠকের জন্য প্রশ্ন ঃ

চেয়ারে সোজাভাবে বসে থাকা কোন মানুষকে কোন ব্যক্তি সোজাভাবে/ কোণাকুনি/ বা উল্টো হয়ে দেখলেও তাকে একইরকম দেখতে লাগে কেন ?

এখন থেকে জিজ্ঞাসা এবং তার সমাধান কলামে একটি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে। উৎসাহী পাঠকরা প্রশ্নটির বিজ্ঞানসম্মত উত্তর লিখে পাঠান। সঠিক উত্তর প্রকাশ করা হবে। এই সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর এপ্রিল মাসের মধ্যে পাঠান। এছাড়া কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও পাঠান। সম্পাদক, সমীক্ষণ

বিজ্ঞানের খবর

অক্টোবর ২০১৫

১.●আই বি এম ঘোষণা করেছে যে কার্বন ন্যানোটিউব দ্বারা সিলিকন ট্রান্সিমিটরকে প্রতিস্থাপিত করার প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যা ১.৮ ন্যানো মিটার নোড সাইজের। (সায়েন্স)

২.●নতুন গবেষণা আবারও প্রমাণ করল যে ডাইনোসর প্রজাতির অবলুপ্তির ক্ষেত্রে ডেকান ট্র্যাপ অগ্নুৎপাত এবং চিকসুলাব-এর উল্কাপাত বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। (সায়েন্স)

●ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে কয়েক দশকের মধ্যেই ফিউশন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের নতুন প্রযুক্তি বাজারে আসবে যা অর্থনৈতিকভাবে কম ব্যয় সাপেক্ষ। এর ফলে প্রচলিত নিউক্লিয় বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষেত্রের প্রযুক্তি পরিবর্তনের জন্য নীতি গ্রহণ করতে হবে সকলকে। (সায়েন্স)

৫.●বে-আইনী ব্যবসা এবং অন্য মনুষ্য ক্রিয়াকলাপের জন্য বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ ক্যাকটাস জাতীয় প্রজাতি অবলুপ্তির পথে। এই তথ্য বিশ্ব ব্যাপী বিস্তৃত অনুসন্ধান করে জানান হয়েছে। (আই ইউ সি এন)

●নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে মঙ্গলগ্রহের মাউন্ট শার্পনারের কাছে প্রাচীনকালের জমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলধারা, যা দিয়ে অতি লবনাক্ত সামুদ্রিক জলের প্রবাহ ছিল আবিষ্কৃত হয়েছে কিউরিওসিটি রোভার রোবট যন্ত্রের সাহায্যে। এই যন্ত্র ওই অঞ্চলের মাটিতে ২০-৪০ হাজারের মত প্রাচীন রেণুর (spore) সন্ধান পেয়েছে। (রিট্রাইভড্)

৬.● ২০১৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন বিজ্ঞানী তাকাকি কাজিতা এবং বিজ্ঞানী আর্থার বি ম্যাকডোনাল্ড। তারা এই পুরস্কার পেলেন নিউট্রিনো দোলন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করার জন্য যা প্রমাণ করেছে নিউট্রিনো কণায় ভর আছে। (বিবিসি)

৭.●বিজ্ঞানী টমাস লিনডাহল, পল এল মডরিচ এবং আজিজ স্যানসার ২০১৫ সালে রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন। তারা এই পুরস্কার পেলেন "আমাদের জিনোমগুলির অখন্ডতা বজায় রাখার মূল প্রক্রিয়া" ব্যাখ্যা করার জন্য। (রিট্রাইভড্)

৮.●নাসা মঙ্গলগ্রহে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার পরিকল্পনা প্রকাশ করল। (নাসা)

●নাসা ঘোষণা করল যে মঙ্গলগ্রহের মাউন্ট শার্পনারের নিকট কিউরিওসিটি রোভার যন্ত্র দ্বারা প্রেরিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে গেল ক্রেটারের নিকট যে-হ্রদ এবং নদীর ধারা পাওয়া গেছে তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ৩.৩-৩.৮ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) বছরের প্রাচীন পলি সঞ্চয় করেছিল। ওই পলি থেকে যে পাললিক পাথরের স্তর সৃষ্টি হয়েছে তা মাউন্ট শার্পনার পর্বতের নিচস্থ পাথরের স্তর হিসাবে আজ দৃশ্যমান। (রিট্রাইভড্)

●নাসা জানিয়েছে যে মহাকাশযান নিউ হরাইজন স্পেস ক্র্যাফ্ট সূর্যের ক্ষুদ্রতম গ্রহ প্লুটোর নীল আকাশ এবং হিমায়িত জল পর্যবেক্ষণ করেছে। (রিট্রাইভড্)

●বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে ব্রায়েন হল্ডেন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা অনুমান করছেন যে ২০৫০ সালে পৃথিবীতে প্রায় ১০০ কোটি অন্ধ মানুষ দেখা দেবে। (রিট্রাইভড্)

●প্রায় ১ বছর বিস্তৃত গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা ২৩৮ প্রকার জিনকে চিহ্নিত করেছেন যা ঈস্টের কোষের বয়ঃবৃদ্ধির কারণ। (রিট্রাইভড্)

১৩.●ক্যানসার আক্রান্ত কোষে ম্যালেরিয়া প্রোটিনকে সংযুক্ত করে সাধারণভাবে ক্যানসার রোগ সারানোর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। বিজ্ঞানীদের দাবি এই পদ্ধতিতে প্রায় ৯০ শতাংশ ধরনের ক্যানসার আক্রান্ত রোগীকে ভবিষ্যতে সুস্থ করা সম্ভব হবে। আগামী ৪ বছরের মধ্যে মানুষের শরীরে এই চিকিৎসার পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

●ফরেনসিক গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে একটি রাসায়নিক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে মানুষের আঙুলের ছাপ থেকে লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। মহিলাদের শরীর থেকে নির্গত ঘামে কিছু উচ্চশ্রেণীর অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে পুরুষের তুলনায়, যা আঙুলের ছাপের রাসায়নিক পরীক্ষা থেকেই ধরে ফেলা সম্ভব হবে। (রিট্রাইভড্)

১৪.●গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল অন্তত ৪১০০ কোটি বছর আগে। অতীতে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল আনুমানিক ৩৮০০ কোটি বছর আগে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীদের মতামত "যদি পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি পূর্বের ধারণা থেকে ৩০০ কোটি বছর আগে হয়ে থাকে তবে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে থাকতে পারে।" (রিট্রাইভড্)

১৫.●সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জলের উপস্থিতিতে বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা আবিষ্কার করেছেন। (সায়েন্স ডেইলি)

২০.●মাটি এবং জল থেকে পারদজনিত পদার্থ দূষণমুক্ত করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা সালফার-লিমোনিন পলিসালফাইড রাসায়নিক দ্বারা প্রস্তুত একটি পদার্থ আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে এটা করা সম্ভব। (রিট্রাইভড্)

●ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানীরা ১০০ প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ক্যানসার রোগের বাহক জিনকে আবিষ্কার করেছেন। (রিট্রাইভড্)

২১.●বিজ্ঞানীরা একটি হোয়াইট ডোয়ার্ফ (বামন তারকা) প্রত্যক্ষ করলেন। এই বামন তারকাটি WD1145+017 তারা থেকে কমপক্ষে একবার বা তার বেশিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহাণুগুলিকে পরিভ্রমণ করছে ৪.৫-৪.৯ ঘন্টায়। (রিট্রাইভড্)

● জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ESO নামক এক অতিকায় টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রবলভাবে উত্তপ্ত ডবল স্টার সিস্টেম (দুই তারকা বিশিষ্ট সৌরজগত) প্রত্যক্ষ করেছেন। VFTS 352 নামক এই দ্বৈত তারকা পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে টারাস্টুলা নেবুলাতে অবস্থিত, যার এক অংশ ম্যাজেলানিক কুয়াশায় আবৃত। (রিট্রাইভড্)

●গ্যালাপোস আইল্যান্ডে প্রকান্ড আকারের ইস্টার্ন সান্টা ক্রুজ কচ্ছপ আবিষ্কৃত হয়েছে যার বৈজ্ঞানিক নাম **চেলোনয়েডিস ডনফাসটই**। এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে পি এল ও এস ওয়ান জার্নালে। (রিট্রাইভড্)

২২.●মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে কুকুরের পেশীর অসুখ (muscular dystrophy)-এর জিন থেরাপির দ্বারা সফল চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। মানুষের উপর এই চিকিৎসার প্রয়োগ কয়েক বছরের মধ্যেই শুরু হবে। (রিট্রাইভড্)

২৩.●হ্যারিকেন প্যাট্রিশিয়া ঝড় পশ্চিম গোলার্ধে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করল, যা এই পর্যায়কালের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। (বিবিসি নিউজ)

●মার্কিন পদার্থবিদরা লেসারের সাহায্যে অনেক বেশি সংখ্যা এবং ঘনত্বের ইলেকট্রনের অ্যান্টি পার্টিকেল পজিট্রন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। (রিট্রাইভড্)

৩০.● আম্স্টারডাম ক্যানসার সেন্টার (VUMC)-এর গবেষকরা একপ্রকার রক্ত পরীক্ষার আবিষ্কার করেছেন, যাতে এক ফোঁটা রক্তের পরীক্ষা করে কোনো মানুষের শরীরে ক্যানসার রোগ থাকার সম্ভাবনার অন্তত ৯৭% সফলভাবে চিহ্নিত করা যাবে। এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় ৬-৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে ভুল ডায়াগনসিস হওয়ার সম্ভাবনা যদিও থেকে যাচ্ছে। (রিট্রাইভড্)

৩১.●পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দূরত্ব তার ১.২৭ গুণ দূর দিয়ে 2015 TB অ্যাস্টেরয়েড অতিক্রম করল। এই অ্যাস্টেরয়েডটির ব্যাস প্রায় ৬০০ মিটার। (বিবিসি নিউজ)

নভেম্বর ২০১৫

৫.● নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে মঙ্গলগ্রহকে প্রদক্ষিণরত MAVEN উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে মঙ্গলের বায়ুমন্ডল বহুকাল ধরে চলা সৌরঝড়ের দ্বারা সৃষ্ট। (রিট্রাইভড্)

●ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক প্রকার চোখের ওষুধ (eye drop) আবিষ্কার করেছেন যা চোখের ছানি (cataract) সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করে। (সায়েন্স ডেইলি)

●বিশ্বে এই প্রথম এক বছর বয়সী একটি শিশুর দূরারোগ্য অসুখ লিউকোমিয়া সারানো সম্ভব হয়েছে জিন পরিবর্তিত ইমিউন কোষ প্রতিস্থাপন দ্বারা। (রিট্রাইভড্)

●স্টেম সেল বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন যে কিভাবে শরীরে রক্তের জন্ম হয়। বিজ্ঞানীদের দাবি এই আবিষ্কার রক্তের জটিলতা সংক্রান্ত বহু অসুখের চিকিৎসায় এক যুগান্তকারি পরিবর্তন এনে দেবে। (সায়েন্স ডেইলি)

১১.●বিজ্ঞানীরা **ডেনিসোভান হোমিনিন** নামক একপ্রকার মনুষ্যজাতীয় বিলুপ্তিপ্রাপ্ত প্রজাতির দাঁতের ফসিল আবিষ্কার করেছেন যার বয়স ১ লক্ষ ১০ হাজার বছর। এই ফসিলে ডি এন এ পাওয়া গেছে যা মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। (রিট্রাইভড)

১২.●এম আই টি-র বিজ্ঞানীরা জলের লবণমুক্তকরণের জন্য এক বিশ্বের ধরণের শক ওয়েভকে ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। (রিট্রাইভড)

১৩.●বিজ্ঞানীরা **হারামিয়াভিয়া** নামক ২০০ মিলিয়ন বছর পুরানো শাকাহারি প্রাণীর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন যাকে প্রথমে প্রাচীন স্তন্যপায়ী প্রাণী মনে করা হয়েছিল। যদিও এখন বিজ্ঞানীদের ধারণা এটি স্তন্যপায়ী নয়, তারও পূর্বপুরুষের একটি শাখাপ্রজাতি। (চ্যাং কেনেথ)

১৮.●অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই প্রথম বহির্বিশ্বের একটি গ্রহের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন যা প্রোটোপ্ল্যানেটরি ডিস্ক থেকে জন্ম নিয়েছিল, এই গ্রহরূপী বস্তুটি (এল কে সি এ ১৫ বি) পৃথিবী থেকে ৪৫০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। (সায়েন্স ডেইলি)

ডিসেম্বর ২০১৫

১. ৮ কোটি বছর পুরাতন হ্যাডরোসর প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেল যার শরীরে রক্ত সংবহনতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে। (সায়েন্স ডেইলি)

৪.●স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন

●*শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দেখুন*

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

জীব বিবর্তনের মূলে প্রাকৃতিক নির্বাচন নাকি মিউটেশন!

প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে ভাববাদী ধারণায় প্রথম কুঠার আঘাতটি করেন চার্লস ডারউইন। তার রচিত, "অরিজিন অফ দি স্পিসিস বাই ন্যাচেরাল সিলেকশন" গ্রন্থে প্রজাতির উৎপত্তি ও জীব বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারণা এবং সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ পেশ করা হয়। শুরু হয় জীববিদদের মধ্যে প্রজাতির উৎপত্তি ও জীববিবর্তনের বিষয়ে বস্তুবাদী ধারনার সংগ্রাম। চলে বস্তু থেকে ধারণা, আর প্রকৃতির মধ্যে সেই ধারণার পক্ষে, বিপক্ষে বস্তুগত প্রমাণ সংগ্রহের অনুসন্ধান। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় জীববিদদের মধ্যে, বংশগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রের বিষয়ে দুটি বিপরীত মতবাদ উঠে আসে। একদল বলেন জীব বৈচিত্রের কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের ফলে অর্জিত গুণাবলী অর্থাৎ অভিযোজন। অন্য দল বলেন মিউটেশনই প্রধান। মিউটেশন দেহকোষ ও জনন কোষ – উভয় কোষেই ঘটে। দেহ কোষের মিউটেশন পরবর্তী প্রজন্মে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। আর যদি জনন কোষে মিউটেশন ঘটে তবে তা পরবর্তী প্রজন্মের জননকোষ ও দেহ কোষে পরিবর্তন আনে – যা সৃষ্টি করে বৈচিত্র। প্রকৃতপক্ষে বড় মাপের বৈচিত্রই, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রজাতির ব্যবধান ঘটায়। অর্থাৎ নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। ১৯৪৩ সালে সালভাদর লুরিয়া (Salvador Luria) এবং ম্যাক্স ডেলব্রাক (Max Delbruck) এই বিতর্কের অবসানে এক গবেষণায় অবতীর্ণ হন এবং দেখান যে পরীক্ষার ফলাফল, "মিউটেশনবাদ"কেই সমর্থন করছে।

সম্প্রতি, আমেরিকার ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়নবিদ কেন প্রাহোদা ও তার অনুগামীদের গবেষণা পত্র, বিজ্ঞান পত্রিকা, "ই লাইফ"-এ প্রকাশিত হয়েছে। যাতে তারা দাবি করেছেন, এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীব – বিবর্তনের মূলে রয়েছে মিউটেশন। "অ্যানসেস্ট্রাল প্রোটিন রিকনস্ট্রাকশন" প্রযুক্তিতে এখনকার প্রাণীদের ডিএনএ বিশ্লেষণ করে খুঁজে বার করা হয়েছে, বহু কোটি বছর পূর্বের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীদের ডিএনএ। "কোয়ানোফ্ল্যাজেলেট" নামক এককোষী প্রাণীরা মাঝে মধ্যেই এক সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে অবস্থান করে, যখন তাদের ফ্ল্যাজেলাগুলি বাইরের দিকে থাকে। বিশেষ ধরণের খাবার আহরণের জন্যই তারা যুথবদ্ধ অবস্থায় একটিমাত্র ইউনিট রূপে কাজ করে। বিজ্ঞানীদের দাবি এককোষী থেকে বহুকোষী হয়ে ওঠার এটাই প্রথম ধাপ।

প্রাহোদা ও তার সহবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, যে প্রোটিন আগে একটি এনজাইম রূপে কাজ করত, তা পরে, "ইন্টার অ্যাকশন ডোমেইন" রূপে কাজ করছে। কিন্তু কেন? এটি ঘটেছে একমাত্র মিউটেশনেই। এতে প্রোটিনের কাজের ধরণ বদলে গিয়েছে – যা এককোষী প্রাণীকে পরিবর্তিত করেছে বহুকোষীতে। বর্তমানের সমস্ত প্রাণীর জিনোমে এই, "ইন্টার অ্যাকশন ডোমেইন" বিদ্যমান।

এই আবিষ্কার আসলে "জীব বিবর্তন বাদ"-এর সপক্ষে আরও একটি প্রমাণ সংযোজন করল। ■

হাঙরের ভার্জিন বার্থ

জীব নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে নিজের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টি করে জনন প্রক্রিয়ায়। নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে এই জনন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন – অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন, যৌন জনন, পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংযোনি। এই অপুংযোনি প্রক্রিয়াটি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী যেমন মৌমাছি, বোলতার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রক্রিয়ায় অনিষিক্ত ডিম্বানু থেকে নতুন বংশধরের সৃষ্টি হয়। মনে রাখা দরকার যে, যে প্রজাতির মধ্যে পার্থেনোজেনেসিস দেখা যায়, সেই প্রজাতির প্রধান ও একমাত্র জনন প্রক্রিয়া এটা নয়। বলা ভাল এটা ব্যতিক্রম মাত্র, তবে অসম্ভব নয়।

সম্প্রতি লন্ডনের গ্রেট ইয়ারমাউথের সি-লাইফ সেন্টারে, হোয়াইট স্পটেড ব্যাম্বু শার্ক প্রজাতির একটি মহিলা হাঙরের গর্ভে অনিষিক্ত ডিম্বানু থেকে দুটি অপত্য হাঙর বেড়ে ওঠার খবর প্রকাশিত হয়েছে। যারা আগামী ৯ মাসের মধ্যে জন্ম নেবে। বিজ্ঞানীরা এব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন, নির্দিষ্ট স্ত্রী হাঙরটি দুবছরের বেশি সময় ধরে কোন পুরুষ হাঙরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থেকেও গর্ভধারণ করেছে। মেরিন বায়োলজিস্ট এবং হাঙর বিশেষজ্ঞ গ্যারেন গুক বলেছেন যে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রে

এমন 'ভার্জিন বার্থ' তারা আগে কখনো লক্ষ্য করেননি। কিন্তু একই সময়ে জার্মানির মিউনিখ থেকেও অন্য একটি ব্যাম্বু শার্কের ক্ষেত্রে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গর্ভধারণের খবর পাওয়া গেছে। দুটি পৃথক ক্ষেত্রে একই প্রজাতির প্রাণীর পার্থেনোজেনেসিস-এর ঘটনা হাঙরের বংশ বিস্তারের একটি পদ্ধতি যে পার্থেনোজেনেসিস হতে পারে তার সম্ভাবনাই বৃদ্ধি করেছে। এই ঘটনাই, প্রকৃতি তথা জীবজগত সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধানের ব্যাকপতার প্রয়োজনটাই স্বীকার করে। মৌমাছির ক্ষেত্রে যেমন শুধুমাত্র, 'ড্রোন' – পুরুষ মৌমাছিরাই পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় জন্মায়, হাঙরের পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ার ফলাফলের কোন বিশেষত্ব আছে কিনা তা আগামী দিনের অনুসন্ধানের বিষয়রূপে সূচিত হল। ■

যীশু'র মুখশ্রী প্রসঙ্গে

খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক, যীশু'র চেহারা ও মুখশ্রী নিয়ে বিতর্ক বহু দিনের। মানুষের চেহারা বা মুখশ্রী কেমন হবে তা নির্ভর করে প্রধানত "জিন"-এর উপর। যা হলো অভ্যন্তরীণ শর্ত। সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশের বাহ্যিক প্রভাব তো থাকেই। এছাড়াও চেহারার বাহ্যিকরূপে প্রভাব ফেলে কি ধরণের শ্রমের সঙ্গে সে যুক্ত এবং কী ধরণের খাবার সে খায়।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ তেমন একটা ছিল না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগ থাকলেও সাধারণের মধ্যে ভিন্-দেশীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ ছিল। ফলে, সাধারণ দাস পরিবারগুলির মধ্যে ভিন্ দেশীদের সঙ্গে জিনের সংমিশ্রণের সম্ভাবনাও ছিল না। যীশু'র জন্ম যেহেতু জেরুজালেমের দাস পরিবারে, সেহেতু এক্ষেত্রে এরূপ জিনের সংমিশ্রণের সম্ভাবনাও প্রায় থাকেই না। আজ বিশ্বব্যাপী মানব জাতির সংমিশ্রণের পরেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন দেশের মানুষকে চেহারার পার্থক্যে সহজেই পৃথক করা যায়। আবার একই দেশের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের চেহারায়, চোখে পড়ার মত পার্থক্য থাকে না বলেই বাহ্যিক কৃত্রিম রূপ (পাগরী, টুপি, দাড়ি, পৈতা ইত্যাদ) ধারণ করতে দেখা যায়।

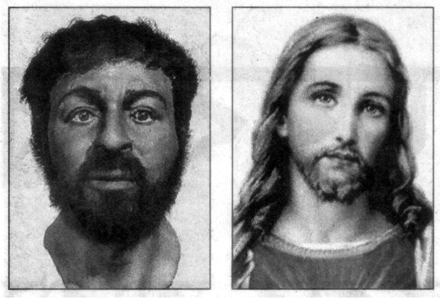

ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক রিচার্ড পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং বাইবেলে সন্ত ম্যাথিউয়ের এবং সন্ত পলের বিবরণের সাহায্য নিয়ে যীশু'র মুখের গঠন অনুমান করেন। জেরুজালেমে সংরক্ষিত বহু শতাব্দী পূর্বেকার তিনটি মাথার খুলির উপর পরীক্ষা চালিয়ে, "ফরেন্সিক অ্যানথ্রোপলজির" সাহায্যে যীশুর যে মুখশ্রী তাঁরা উপস্থাপন করেন, তা ঐতিহাসিকভাবে তৎকালীন জেরুজালেমের অন্যান্য ইহুদী পুরুষের অনুরূপ।

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসক্রমিক উদ্ভব প্রসঙ্গে ব্রুনো বাউয়ের গবেষণা থেকে জানা যায় যে আলেকজান্দ্রীয় ইহুদী "ফিলো" খ্রিস্ট ধর্মের প্রকৃত জনক এবং রোমক স্টোইক সেনেকাকে বলা যেতে পারে সেটার পিতৃব্য। যে যীশু দাস প্রথা অবসানে রাজাকে অস্বীকার করে আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করেছিলেন, তার বাণী সম্মিলিত বলে প্রচারিত, "নিউ টেস্টামেন্ট" দাস প্রথা সম্পর্কে প্রশ্নহীন হতে পারে কি? দাস ব্যবস্থার বিরোধী হওয়ায়, যে শাসকশ্রেণী যীশুকে হত্যা করেছিল, পরবর্তীকালে সেই শাসকশ্রেণীর সম্রাট কনস্টান্টাইন দাস ব্যবস্থা বজায় রাখতে খ্রিস্ট ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মরূপে ঘোষণা করল কেন? এ সবের উত্তর, খ্রিস্ট ধর্ম কিরূপে সার্বলৌকিক ধর্ম হয়ে উঠল – প্রথম তিন শতাব্দীর চার্চের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

সুতরাং নিউটেস্টামেন্ট সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যীশুর প্রচারিত মুখশ্রী/অবয়ব পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টিকে অসম্ভব বলে গণ্য করে না। ■

আবিষ্কারের কাহিনী ঃ

স্টেথোস্কোপ এবং এর আবিষ্কারের বিস্ময়কর কাহিনী

বর্তমানে ডাক্তার বলতেই চোখে ভাসে স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে রাখা একজনকে। এই যন্ত্র ছাড়া ডাক্তারির কথা এখন ভাবা যায় না। হয়তো গলায় ঝোলা স্টেথোস্কোপই এখন একজন ডাক্তারকে চেনার সবচেয়ে সহজ এবং প্রচলিত উপায়। কিন্তু ঊনিশশো শতাব্দীতে এটি ছাড়াই ডাক্তারকে রোগীর হৃদস্পন্দনের হিসেব কষতে হতো। মূলত হাত দিয়ে নাড়ি অনুভব করে বা বুকে কান পেতে হৃদ্‌স্পন্দন শুনে ডাক্তারকে সিদ্ধান্ত নিতে হতো। একে বলা হয় ইমিডিয়েট অস্কালটেশন ('অস্কাল্টেশন' হল দেহের অভ্যন্তরীণ শব্দ শোনার প্রক্রিয়া)।

১৮১৬ সালে ফরাসী ডাক্তার রেনে থিওফাইল হায়াসিন্থে লেনেক (Rene-Theophile-Hyacinthe Laennec, উরিব্বাস! নিজ দায়িত্বে উচ্চারণ করবেন।) এক রোগীর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করতে গিয়ে অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। রোগী অত্যধিক স্থূল হওয়ায় রেনে হাত দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে পারছিলেন না। আবার রোগী একজন তরুনী বলে রেনে বুকে কান পেতেও পরীক্ষাটি করতে পারছিলেন না। ফলে সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি শব্দ বিজ্ঞানের আশ্রয় নেন।

তাঁর মনে পড়ে ওই পদ্ধতির কথা, যেখানে কাঠের টুকরোর এক পাশে কান রেখে অন্য পাশে টোকা দিলে সেই শব্দ স্পষ্টভাবে শোনা যায়। সাথে সাথে তিনি একগোছা কাগজ রোল করে চোঙের মতো বানান এবং সেটার এক পাশ রোগীর বুকে রেখে অপর পাশে নিজের কান লাগান। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন, এতে করে হৃদ্‌স্পন্দন যতটা স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে অন্য রোগীর বুকের উপর সরাসরি কান পেতেও এতটা স্পষ্ট কখনো শোনা যায়নি। কারণ বায়ু মাধ্যমের চেয়ে কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ বেশি। আর এই যে বুকের উপর সরাসরি কান না পেতে বা হাত দিয়ে স্পর্শ না করে, মাঝখানে একটা মিডিয়া ব্যবহার করে হৃদ্‌স্পন্দন শোনার প্রক্রিয়া একে বলে (Medi-ate Auscaltation) মেডিয়েট অস্কাল্টেশন।

শোনা যায়, এই আইডিয়াটা রেনের মাথায় এসেছিলো ছোট বাচ্চাদের খেলা দেখে, ১৮১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ঠান্ডা ঠান্ডা এক সকালে ল্যুভর প্রাসাদের উঠান দিয়ে হাঁটার সময় পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী রেনে দেখেন দুটো স্কুল পড়ুয়া শিশু একটা

রেনের স্টেথোস্কোপ

লম্বা আর ফাঁপা কাঠ নিয়ে খেলছে। একজন একপ্রান্তে একটা পেরেক দিয়ে আঁচড় কাটছে অন্যজন আরেকপ্রান্তে কান লাগিয়ে শুনছে। কাঠটি আঁচড়ের শব্দকে অ্যাম্পলিফাই করে অপর প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়া ধারণা করা হয় বাঁশের বাঁশি বাজাতে ও নাকি রেনে ওস্তাদ ছিলেন।

রেনের তৈরী প্রথম স্টেথোস্কোপটি ছিল ২৫ সেমি লম্বা আর ২.৫ সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট কাঠের ফাঁপা চোঙ। পরে তিনি তিনটি আলাদা টুকরোয় ভাগ করেন এই যন্ত্রকে। এই যন্ত্রের নাম রেনে স্টেথোস্কোপ রেখেছিলেন কারণ Stethos মানে বুক এবং skopos মানে অনুসন্ধান। তবে এই যন্ত্রটিকে তখনকার সব চিকিৎসক সমাজ খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেন নি।

১৮৫১ সালে আর্থার লিরেড দুই এয়ারপিস (Air-piece) যুক্ত আধুনিক স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবন করেন এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য এটির নকশাকে খুঁতযুক্ত করে তৈরী করেন জর্জ ক্যামান ১৮৫২ সালে। তখন থেকেই শেষোক্তটি স্টেথোস্কোপের স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

রেনে লেনেক ও তার জীবন

যে ব্যক্তি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন বিপ্লব এনে দিলেন তার জীবন সম্পর্কে কিছু না লিখলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর উপরি হল তাঁর জীবন খুবই ঘটনা বহুল। পড়তে ভালোই লাগবে। বিরক্ত লাগবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

রেনে লেনেক ১৭৮১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, ফ্রান্সের কুইম্পারে জন্মগ্রহণ করেন। রেনে যখন মাত্র পাঁচ বছরের শিশু তাঁর মা 'মিশেল ফেলিচিতে লেনেক' মারা যান। পেশায় আইনজীবী খরচে দুর্নাম কুড়ানো বাবা 'থিওফাইল মারি লেনেক' তার দুই ছেলের দেখাশোনা করতে অপারগ ছিলেন। ফলে

রেনে তার গ্রান্ড আঙ্কল (বাবার কাকা) এর কাছে চলে যান।

ছোটোবেলায় রেনের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল। তিনি অবসন্নতায় ভুগতেন আর মাঝে মাঝে অনেকদিনের জন্য তার জ্বর আসতো। ধারনা করা হয় তাঁর হাঁপানিও ছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে বিষণ্নতায় ভুগলেও তিনি সংগীতের মধ্যে মানসিক শান্তি খুঁজে পেতেন। তার অবসর সময় কাটত বাঁশি বাজিয়ে কিংবা কবিতা লিখে।

গ্রান্ড আঙ্কেলের কাছে কয়েক বছর থাকার পর ১৭৯৩ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় বারো বছর বয়সে রেনে পশ্চিম ফ্রান্সের নঁত (Nantes) শহরে যান। তাঁর কাকা 'ডাঃ গুইলাউমে লেনেক' সেখান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলেন। বিপ্লবের উত্তাল সময়েও রেনে কাকার বাড়িতে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজি ও জার্মান ভাষা রপ্ত করেন ও অনেক পুরস্কারও জেতেন। ডাঃ গুইলাউমে তাঁকে ডাক্তারি পড়তে উৎসাহ দেন। রেনে ও কাকার অধীনে ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। ১৭৯৫ সালে, মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে নঁত শহরের হোটেল ডিউ'তে অবস্থানরত অসুস্থ এবং আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের সেবা করতে শুরু করেন। ১৭৯৯ সালে, আঠারো বছর বয়সে হোটেল ডিউতেই তিনি তৃতীয় শ্রেণীর সার্জন হিসাবে চাকরি শুরু করেন।

রেনে ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী একজন ছাত্র। তিনি অনেকগুলি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ১৮০০ সালে তিনি প্যারিসে অবস্থিত 'ইকোল প্রাতিক' নামক প্রতিষ্ঠানে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা শেখার জন্য ভর্তি হন। রেনের শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত গবেষক গুইলম ডুপইট্রিন (Guillaume Dupuytren), সম্রাট নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিকোলাস মারেস্ট (Nicolas Marest) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় (১৮০১) রেনে মেডিসিন এবং সার্জারি উভয় বিষয়েই প্রথম হন। ১৮০২ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন এবং ১৮০৪ সালে ডাক্তারি পাশ করেন।

পারিবারিক পরিস্থিতি, যক্ষ্মায় ভুগে ডাক্তার কাকার মৃত্যু, গুইলম ডুপইট্রিন-এর অধীন থেকে বেরিয়ে আসা, আর্থিক টানাপোড়েন সৃষ্টি ইত্যাদি নেতিবাচক ঘটনা রেনের কাজের ধারাবাহিকতাকে নষ্ট করে দেয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হওয়ার আশায় তিনি ব্রিটানি নামক অঞ্চলের গ্রাম্য এলাকায় চলে যান, সেখানকার জলবায়ু তাকে সুস্থ করে তোলে।

জীবনে এতো প্রাপ্তি ও সফলতা সত্ত্বেও রেনের মস্ত এক আক্ষেপ ছিল। প্যারিসের কোনো বড় হাসপাতালে তিনি চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ১৮১৬ সালে প্যারিসের নেক্টার হাসপাতালে তিনি নিয়োগ পান এবং খুশি মনেই সেখানে যোগ দেন। এখানে আসার পর তিনি এই বৈপ্লবিক আবিষ্কারটি করেন। এরপর তাঁর জীবনে একটার পর একটা সাফল্য আসতে থাকে। রেনেকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল অস্কাল্টেশনের জনক। তিনি সর্বপ্রথম নিজের আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ শুনে ব্রনকিকট্যাসিস (Bronchiectasis) যকৃত সিরোসিস (Liver Cirrhosis) সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এছাড়া তিনি স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ যেমন – নিউমোনিয়া, টিবি, ব্রনকাইটিস্, প্লুরেসি, এমফাইসেমা, নিউমোথোরাক্স ইত্যাদির শ্রেণীবিভাগ করেন।

তিনি ১৮২৪ সালে ৪৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন মিস আর্গনকে। এরপর ক্রমশ রেনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ধরা পড়ে যে, তাঁর ও যক্ষ্মা হয়েছে। সে সময় "যার হয় যক্ষ্মা তার নেই রক্ষা'। ১৮২৬ সালের মে মাসে রেনের জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট চরম আকার ধারণ করে। তিনি সুস্থ হওয়ার আশায় ব্রিটানির সেই গ্রামে আবার ফিরে আসেন। ব্রিটানির আবহাওয়া তাকে সামান্য উজ্জীবিত করলে ও পুরোপুরি সুস্থ করতে পারে নি। ব্রিটানিতে যাওয়ার চার মাস পরে ১৮২৬ সালের অগাস্টের ১৩ তারিখে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নিজের শেষ দিনগুলোতে রেনে তার ভাগ্নে 'মেরিয়াদেক'কে বলেছিলেন স্টেথোস্কোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করতে এবং সে কি শুনছে সেটা বলতে। মেরিয়াদেক যখন কাজটি করলেন, তখন রেনে খুব সহজেই বুঝতে পারলেন শব্দের নির্দিষ্ট প্রকৃতিটি। তিনি এই প্যাটার্নের শব্দ বহুবার বহু রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শুনেছেন। আর এই শব্দের ধরণ দেখে তিনি বুঝে গেলেন তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র বলছে তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত। And the Irony is ... রেনে তার আবিষ্কার দিয়ে পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় করতে পারতেন। কিন্তু শেষে কিনা নিজের দেহে সেটাকে ব্যবহার করতে হল নিজের আবিষ্কারকে আর যন্ত্র বলছে আবিষ্কারকের যক্ষ্মা হয়েছে ! রেনে লেনেক ও মিস আর্গন ছিলেন নিঃসন্তান, তিনি তাঁর সবকিছুই মেরিয়াদেক'কে দিয়ে গিয়েছিলেন। সর্বোপরি সেই স্টেথোস্কোপকে যাকে তিনি আখ্যায়িত করেছিলেন "The greatest legacy of my life."। ■

কৃষ্ণ গহ্বর (Black Hole)

The Lifecycle of a star (তারার জীবনচক্র)

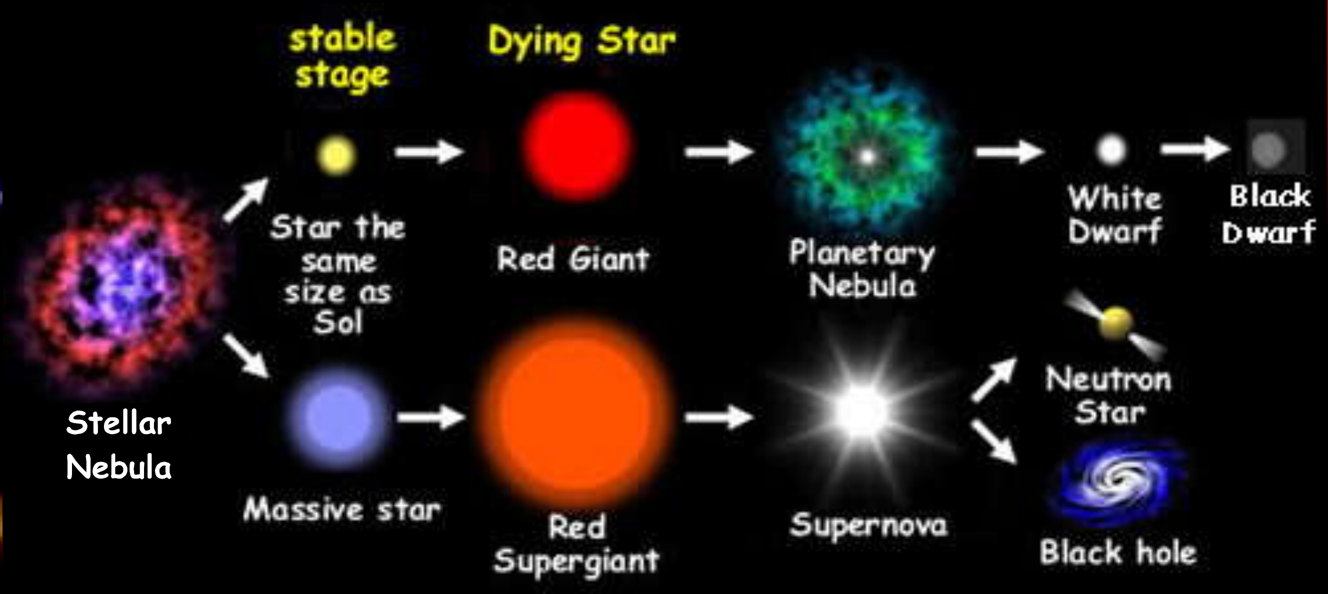

মহাকাশের অনুসন্ধানে

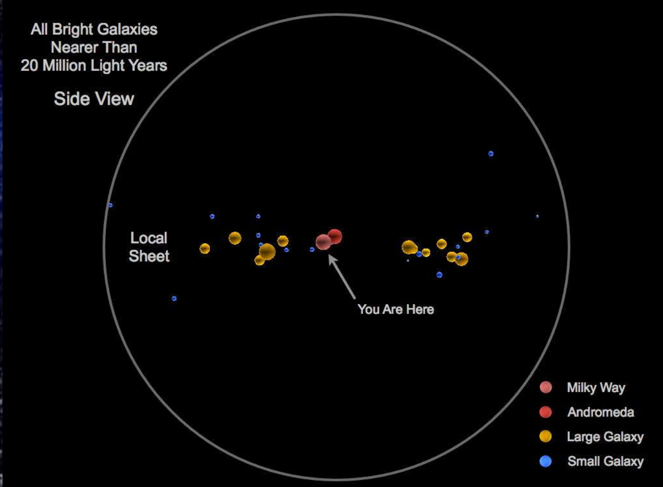

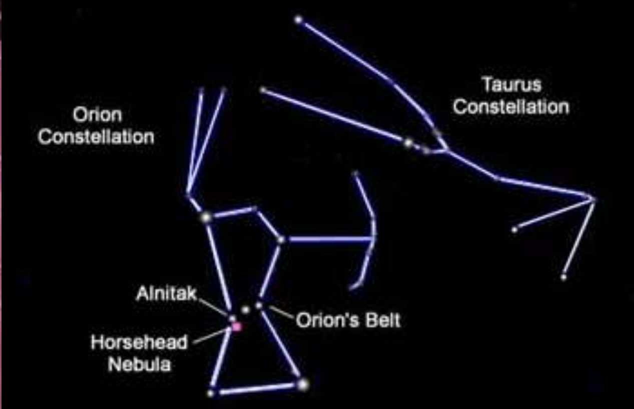

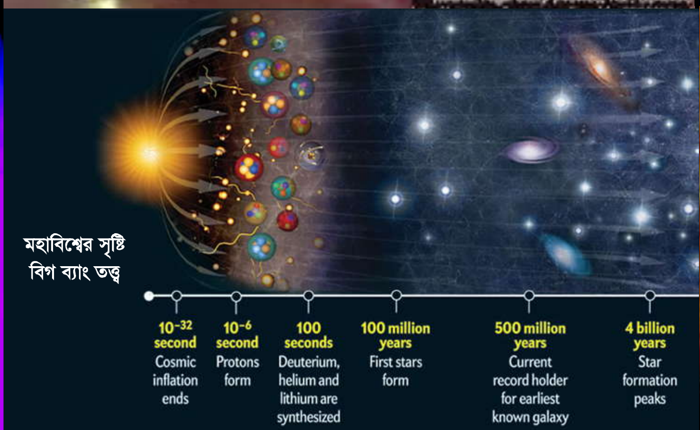

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com
সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা